জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

জীবন-স্মৃতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেট, শিশির-পাব্‌লিশিং-হাউস্, হইতে

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ফাল্গুন, ১৩২৬

মূল্য দুই টাকা।

LOST PAGES
(plates & ports.)

Page- 15 - 16
" 27 - 28
" 55 - 56
" 91 - 92
" 97 - 98
" 139 -140
" 149 -150
" 215 -216

[illegible]
13.vi.79

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
জীবন-স্মৃতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেট, শিশির-পাব্‌লিশিং-হাউস্, হইতে
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ফাল্গুন, ১৩২৬

মূল্য দুই টাকা।

LOST PAGES
(plates & ports.)

Page- 15 - 16

" 27 - 28

" 55 - 56

" 91 - 92

" 97 - 98

" 139 -140

" 149 -150

" 215 -216

13.ii.79.

গঙ্গাজলেই গঙ্গা-পূজা করিলাম—

লেখক

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কথা সন ১৩২১ সালে, বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা ছিলেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা এবং মুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের মহার্ঘতাহেতু নানাকারণে, এতদিন গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতে পারি নাই।

১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে "সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" ও ১৩২১ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি"র শেষাংশটুকু, গ্রন্থের সুসঙ্গতি রক্ষার্থে 'সূচনা'য় দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, "জীবন-স্মৃতি"র বহুল অংশকে এই গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত আকার দান করা হইয়াছে।

এই স্থানে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীই আমায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষরূপে প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করিয়া, আরম্ভ হইতে নানা প্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট তেইশ খানি ব্লকও, তিনিই আমায় দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এ পুস্তকখানি কখনই রচিত হইতে পারিত না।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এবারেও আমায় কতকগুলি ব্লক দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। বাকীগুলি নূতন তৈরি করান' হইয়াছে।

ফটোগ্রাফের অভাবে দু'একখানি প্রয়োজনীয় চিত্র এবার দিতে পারা গেল না; দ্বিতীয় সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধিত করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি সন ১৩২৬ সাল, ২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার দোলপূর্ণিমা,—(ইংরাজী ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২০)

১৪এ, রামতনু বসুর লেন,
কলিকাতা } শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

চিত্র-সূচী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

সূচনা

ইংরাজি ১৯১২ সাল ১লা এপ্রিল, সম্রাটের আদেশে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইল। আমি স্থানান্তরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম ;— এপ্রিলের শেষভাগে বদলি হইয়া রাঁচিতে পৌঁছিলাম। সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাঁচিতে স্থায়িভাবে অবস্থান করেন ইহা আমার পূর্ব্বাবধিই জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ তৎপূর্ব্বে আমার ঘটে নাই—সুতরাং রাঁচিতে পৌঁছিয়াই সেই সৌভাগ্যলাভের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল।

রাঁচি, ২৯শে এপ্রিল, সোমবার। সন্ধ্যা ৬টার সময় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে বাহির হইয়া প্রায় ৬৷৷০টার সময় তাঁহার নব-নির্ম্মিত "শান্তিধামে" গিয়া উপস্থিত হইলাম। "মোরাবাদী" নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসভবন। পাহাড়ের উপরে একটি কোঠা-বাড়ী ও তাহার

সানুদেশে তিনটি বাঙ্গলা। সেদিন রাত্রিটি বড় পরিষ্কার ছিল। মাথার উপর আকাশভরা জমাট জ্যোৎস্না, পায়ের তলে সবুজ ঘাস; পথের পাশে-পাশে অগণিত পার্ব্বত্যবৃক্ষগুল্মের উপবন; আর দূরে, প্রকৃতির চন্দ্রালোকিত সেই নৈশবাসর-কক্ষে চিত্রিত প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত কালো কালো পাহাড়ের শ্রেণী—একটানা, অচ্ছিন্ন, যেন অঙ্কিত। পাহাড়তলীর মেঠো পথে কোল মজুরেরা গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। এ নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে ইহাদের কোলাহলেই প্রভাতের আলো ফুটে, আবার ইহাদের কোলাহলেই দিনের আলো শেষ হয়। এই কোল-নরনারীর সম্মিলিত-সঙ্গীতেই প্রতিদিন এখানে নিসর্গমঞ্চে আলো-আঁধারের পটপরিবর্ত্তন হয়।

বাণী ও কমলার বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সময়ে নীচের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। বন্ধুবর একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আমি একটু অগ্রসর হইয়া একজন ভৃত্যকে বলিলাম, "বাবুকে বল, আমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

জ্যোতিবাবু যেখানে ছিলেন ভৃত্য আমাদিগকে একবারে সেই স্থানেই লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু আমরা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে সে বলিল, "তবে হামি বাবুকে বলিয়া দিচ্ছি, আপ্ লোগ্ ঠার্ করুন্।"

ভৃত্য যেমন সংবাদ দিল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই জ্যোতিবাবু একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম দীর্ঘ, ঋজু, কৃশ, গৌরবর্ণ একটি মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে। সে মূর্ত্তি প্রসন্ন, হাস্যোজ্জ্বল, কোমল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ স্নেহভরা। ললাট প্রশস্ত, নাসা উন্নত, মুখশ্রী সৌম্য, সরল এবং প্রতিভাদীপ্ত। সেই অস্পষ্ট স্নিগ্ধ

"শান্তিধাম"

জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত, ততোধিক স্নিগ্ধ ও কান্তবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব মনে করিয়া আমরা দুইজনেই কিছুক্ষণ বাক্য হারাইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম ; সম্ভ্রমে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমরা তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলে, তিনি আমাদিগকে নীচেই একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সে কি সৌজন্য,কি স্নেহ ! সে সময় বহুদিন এমন স্নেহের কথা শুনি নাই বলিয়াই তাঁহার স্নেহ যেন আমরা দ্বিগুণ পরিমাণে অনুভব ও উপভোগ করিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তায় সেখানে বিঘ্ন ঘটিতে পারে ভাবিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আঁকা বাঁকা পথে পাহাড়ের উপরের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এই উপরের বাড়ীতেই তিনি আজকাল থাকেন, নীচে কখন কখনও কোনও কাযে বা ভ্রমণের সময় নামিয়া আসেন। উপরে উঠিতে উঠিতে আমাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আপনারা রবি ভাবেন নি ত ?"

আমরা সেরূপ ভুল করি নাই, জানাইলাম। তার পর তিনি আমাদের পরিচয় শুনিয়া, একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ আপনার নাম যে আমি জানি, মধ্যে মধ্যে আপনার লেখা পড়ে' থাকি।" এই বলিয়া, তিনি আমার একটি কবিতার খুব প্রশংসা করিলেন।

উপরে গিয়াই তিনি আমাদিগকে তাঁহার উদ্যানবাটিকায় লইয়া গেলেন। সেখানে ছোট ছোট পুষ্পতরুগুলির তলদেশে সমাকার শ্বেত উপলখণ্ডগুলি আলিপনার ন্যায় সজ্জিত ; লতাগুলি উদ্যানমধ্যে, প্রাচীর-গাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন,—নানাবিধ পুষ্পলতার বিচিত্র গন্ধে বর্ণে পুষ্প-বাটিকাটি তপোবনের মত সুন্দর, পবিত্র এবং মনোরম। তিনি বলিলেন, কয়েকদিন হইল, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মহামান্য

ছোটলাট বাহাদুর (Sir Charles Bayley) সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। জ্যোতিবাবু তখন নীচে ছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে লাটসাহেব তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন। লাট বাহাদুর পুষ্পবাটিকাটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন, এবং জ্যোতিবাবুর জনৈক অতিথি অবিনাশ বাবু, যিনি লাটবাহাদুরকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “I envy you Babu.”

পাহাড়টির সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত উপাসনামন্দির আছে। মন্দিরটি সহরের প্রায় সমস্ত স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থও ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরটি ছোট ; কেবল চারিদিকে চারিটি স্তম্ভ ও মাথায় একটি ছাতার মত ছাদ। লম্বে প্রস্থে মন্দিরটি ১২।১৪ ফুটের বেশী নয়। এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে জ্যোতিবাবু কাশী হইতে মিস্ত্রী ও প্রস্তর আনাইয়াছিলেন—এবং নীচে হইতে উপরে পাথর উঠাইতেও ২।৩ মাস কাল বৃথা ব্যয় হয়। মিস্ত্রীরাও বসিয়া বসিয়া ২।৩ মাস বেতন লইয়াছিল,—ইত্যাদি নানা অসুবিধায় ন্যায্য যাহা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এখানে তাঁহাকে বড়ই জলকষ্টে ভুগিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দূরে একটি ঝরণা ছিল, তাহা হইতে জল আনাইয়া কোনও রকমে মিস্ত্রীর কায এবং নিজেদেরও ব্যবহার চলিত।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা পাহাড়টির উষ্ণীষের মত এই মন্দিরটির মেঝেতে আসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলাম।
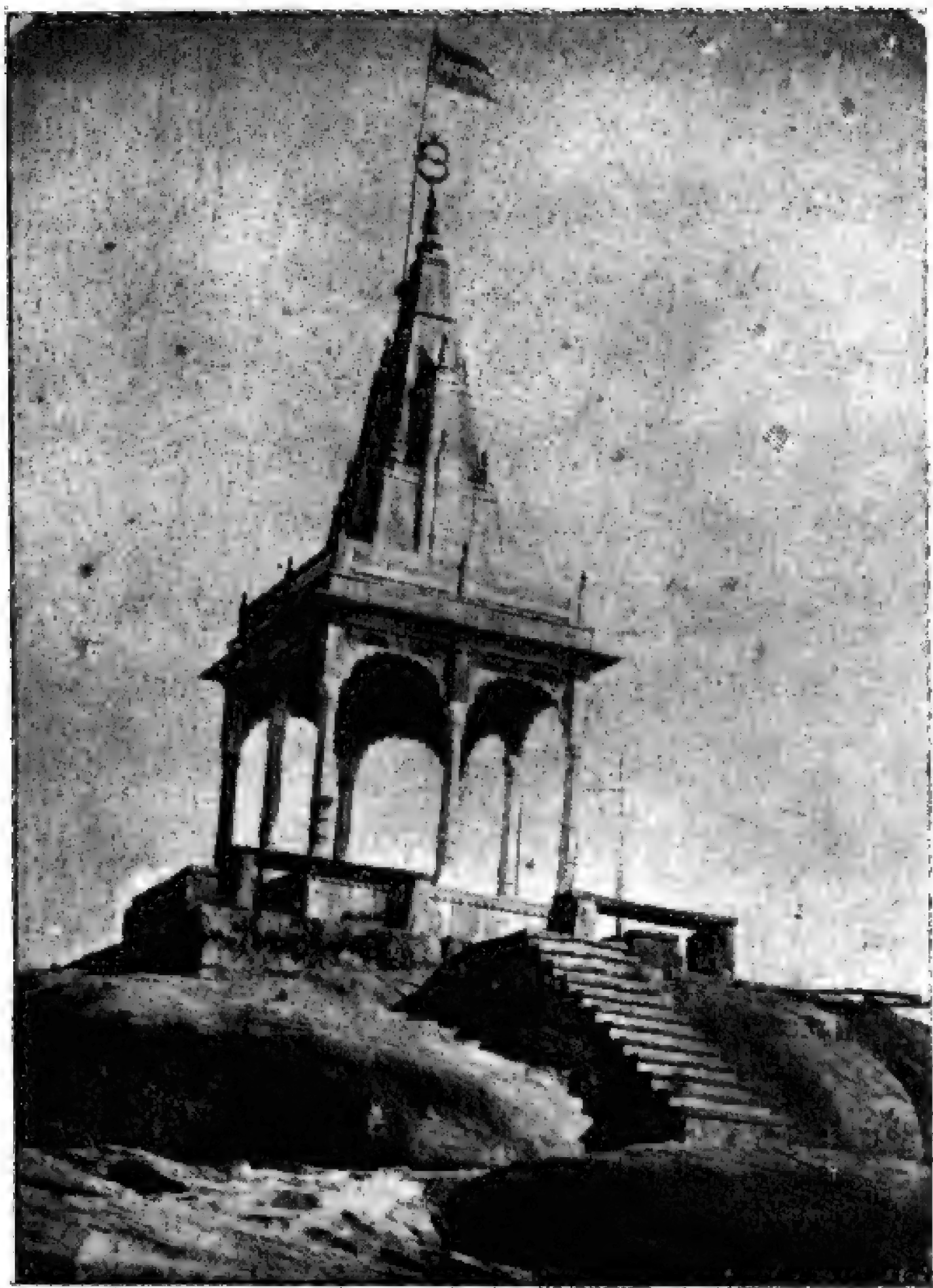
উপাসনা মন্দির

সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন লোকে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নূতন নূতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।"

নূতন লেখকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে।" গল্পলেখার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক, তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই জমে না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, "প্রবাসী," "ভারতী," "বঙ্গদর্শনে" একটু একটু লিখিয়া থাকি। লিখিতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না।"

ভাষার আলোচনায় তিনি বলিলেন, "আজ কাল দু'টো নূতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"। অনর্থক শব্দ বিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে, আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে

গোল মিটে যায়। যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্‌চ?" এই বাক্যে ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা অনুসারে "তুমি কি বল্‌চ?" বা "তুমি কি-বল্‌চ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেখানে "সদৃশ"—সেখানেও আবশ্যক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই!"

"যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্নপ্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফার্‌শী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না, তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাযেই অর্থ না বুঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আমাদের ভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য আমি V লিখতে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লিখি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হ্ব" অনেকটা Vর মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস না লিখিয়া "হ্বিনাস" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষরনির্ব্বাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গিয়া বিজয়বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয় বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান।...তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয়

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

(২)

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিকই শান্তিধাম। এখানে আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে, ফটকের উপরে ধ্যানীবুদ্ধের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিধামের আর একটি বিষয় বাকী রহিয়া গিয়াছে। প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনা-আপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত-আট জন লোক অনায়াসে সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথরগুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্-বাঁধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি একেবারে আচ্ছন্ন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এইবার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তনপান করে, এবং দিন-রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্ছাটিকে লইতে গেলে রূপী একবারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন খায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে তড়িতাহতের ন্যায় উচ্চকিত হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে ফিরিয়াছে। হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

শান্তিধামের দর্শকসংখ্যাও বড় কম নয়! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা ও অপরাহ্ণে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের বিষম ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে

আগে অনুমতি লইয়া তবে উপরে উঠেন। যদিও এরূপ অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই তাঁহারাও জানেন—তথাপি একটা ভদ্রতা বা সভ্যতাসূচক কায়দার জন্য তাঁহারা বিনা অনুমতিতে কখনও উপরে আসেন না।

৫ই মে, ১৯১২, রবিবার। নিমন্ত্রণরক্ষা-কল্পে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত ঠিক ৬॥০টার সময় "শান্তিধামে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নীচে হইতে পাহাড়ের উপরের ঘর পর্য্যন্ত পথটি দীপমালায় আলোকিত। ফটকে তিন চারিজন দারোয়ান্ ছিল—তাহাদেরই একজন আমাদিগকে উপরে লইয়া গেল। উপরে যাইবামাত্রই জ্যোতিবাবু সস্নেহে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজে যেমন মিষ্টমুখে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন, তেমনি আমাদিগকেও বেশ বস্তুতান্ত্রিকভাবে মিষ্টমুখ করাইয়া দিলেন। সেদিন সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোক প্রায় সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত ছিলেন।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় "বাল্মীকি-প্রতিভা" আরম্ভ হইল। প্রথমত "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সারাংশটি তিনি মিষ্টমধুর ভাষায় বিবৃত করিয়া, যেখানে যেরূপ হাবভাব প্রয়োজন ঠিক তেমনি করিয়া একে একে সমস্ত গানগুলি গাহিয়া গেলেন। গান অপেক্ষা এখনও আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া আছে সেই "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বম্" শ্লোকটি! সে যে কি গভীর ভাবাবেশে ও গম্ভীর স্বরে শ্লোকটি তিনি আওড়াইয়াছিলেন সে যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই সুর যেন এখনও কানে বাজিতেছে। গৌরকান্তি, শুভ্রকেশ, তপস্বীর মত—উজ্জ্বল দীর্ঘ ক্ষীণ দেহযষ্টি উত্তোলন করিয়া যখন তিনি শ্লোক পাঠ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল যেন সত্য-সত্যই বাল্মীকির মুখে সেই আদি-কবিতা শুনিতেছি। "বাল্মীকি-প্রতিভা"র পর সকলের অনুরোধে অন্য বিষয়ক গীতবাদ্যাদিও আরম্ভ হইল।

আমাদের সম্মুখেই Dwarkinএর একটি বিশাল piano ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাদ্য হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভদ্রলোক গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল—আমরাও হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আসরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখা গেল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বেহালা ও পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজয়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত একবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আসিবার সময় তাঁহার কষ্ট হইল বলিয়া আমরা ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ হ'ল!"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক। সে হাসিটি শিশুরমত উচ্চ ও সরল।

আমাদের সম্মুখেই Dwarkinএর একটি বিশাল piano ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাদ্য হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভদ্রলোক গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল—আমরাও হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আসরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখা গেল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বেহালা ও পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজয়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত একবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আসিবার সময় তাঁহার কষ্ট হইল বলিয়া আমরা ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ হ'ল!"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক। সে হাসিটি শিশুর মত উচ্চ ও সরল।

(২)

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিকই শান্তিধাম। এখানে আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে, ফটকের উপরে ধ্যানীবুদ্ধের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিধামের আর একটি বিষয় বাকী রহিয়া গিয়াছে। প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনা-আপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত-আট জন লোক অনায়াসে সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথরগুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্-বাঁধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি একেবারে আচ্ছন্ন।

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ ॥

বোন মঞ্জু, দাদাটির পাশে দাঁড়াইয়া অতি চমৎকার কোরাসে গাহিল। এই গানটির পাশেই ভারতবর্ষের মানচিত্র। এই এক গানেই ছেলেদের মনে স্বদেশের রূপ ও স্বদেশের প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পরিস্ফুট হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ইহার পর জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সেই থিয়েটারটা কর' ত?" অমনি একটা ত্রিপদ টেবিলের নীচে মঞ্জু বুড়ী হইয়া বসিল, আর জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে বসিলেন, সুবীর হাত ছানিয়া তপন আহ্বান করিতে করিতে গাহিতে লাগিল:—

"আয় রদ্দুর ছে—নে, ছাগল দিব মে—নে,
ছাগ্‌লির মা' পাগ্‌লি, ক'খান্ কাপড় পে—লি?"

মঞ্জু গাইল,—

"ছ'খান কাপড় পেলুম্, ছ' বৌকে দিলুম্ (ছয়টি পুতুল ছয়টি বৌ) (কাঁপিতে কাঁপিতে) আপনি মরি জাড়ে, কলাগাছের আড়ে।"

সুবীর গাইল,

"কলা পড়ে টুপ্‌টাপ্, বুড়ী খায় গুপ্‌গাপ্।"

তার পর, দুইজনেই হাসিয়া গড়াগড়ি!

খাতাতেও এমনি একটি ছবি আছে। বুড়ী কলাগাছের নীচে উপবিষ্ট। কলা পড়িতেছে, পাশে ছয়টি বৌ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি বালক হাত ছানিয়া রৌদ্রআহ্বান করিতেছে।

এইরূপ প্রায় ২০।২৫টি কবিতা পড়া হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিবাবু নিজে আবাল্য সঙ্গীতানুরাগী, এইজন্য সঙ্গীতকেও তিনি শিশুদের শিক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া কৌশলে, হাসি-তামাশা গান-নাচের মধ্য দিয়া অধ্যাপনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিবাবুর

ছাত্রেরাও এই অল্পদিনের মধ্যে এবং এই অল্প বয়সে এত শিখিয়াছে যে তাহা ভাবিলে যুগপৎ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়।

বেশ বুঝা গেল, শিক্ষাশালায় শুধু বেত ও নীরস বানান মুখস্থের স্থান একটুও নাই। এই অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রণালী যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, স্বতই তাঁহার চরণতলে মাথা নত হইয়া পড়ে।

একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনার মুখে এত মজার কথা, এত রসের কথা শুনি যে আমার ইচ্ছা হয়, আপনার জীবন-বৃত্তান্তটি আপনার মুখের কথায় লিপিবদ্ধ করি।"

এতদিন তিনি কোনও কিছু আশঙ্কা বা আমাকেও বিভীষণ সন্দেহ করেন নাই! কিন্তু যেমন আমি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম, অমনি তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

নানাপ্রকার যুক্তি-কারণ-প্রদর্শন করিয়া আমায় এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ভবী ভুলিল না। তিনি নিজে যে অধিকার আমায় দিয়াছিলেন, সেই অধিকারের দাবীতেই আমি তাঁহার উপর জুলুম জবরদস্তি আরম্ভ করিয়া দিলাম।

শেষে তিনি হতাশ্বাসে বলিলেন—"দেখ বসন্ত, তোমাকে ত পারবার জো নেই! তুমি যখন ধরেছ—তখন ছাড়্‌বে না। কিন্তু তুমি যে শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই বুড়োকে জনসমাজে টেনে বের কর্‌বে—তোমায় আমি একদিনও সে সন্দেহ করি নাই!" ইত্যাদি।

তিনি জীবনে এমন কোন কার্য্যই করেন নাই, যাহাকে সাহিত্যের উদ্যানে অক্ষরের বেড়া দিয়া রাখা যাইতে পারে প্রভৃতি নানারূপ ওজর আপত্তি আবার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ওজরই যখন টিকিল না—তখন তিনি হতাশ্বাসে বলিলেন, "ওহে তোমায় দেখে এখন আমার বড় ভয় লাগ্‌চে! আমি তাই ভাব্‌চি—তুমি এমন ভয়ঙ্কর কি করে হয়ে উঠ্‌লে?"

বাল্য-স্মৃতি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ইঁহাদের বাড়ীতে সে সময়ে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটেই ইঁহার হাতে-খড়ি হয়। বাড়ীর দুই-চারিজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের অন্যান্য কতকগুলি ছেলে লইয়া গুরুমহাশয় ঠাকুর-দালানে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে পণ্ডিতের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপ-যোড়া কাঁচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।

একটা কালিপড়া মাদুরের উপর পাঠশালার ছেলেরা বসিত। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না; যদি বা কখনও ওষ্ঠপ্রান্তে একটু-আধটু হাসির বক্ররেখা দেখা দিত ত' সে বর্ষণোন্মুখ শ্রাবণমেঘে বিজুরীলেখার মত ছাত্রদিগকে বেত মারিবার সময় সেটুকু ফুটিত। বোধ হয় সে শুধু হাতের সুখ অনুভব করিয়া। পড়াইবার সময় গুরুমহাশয় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া বসিয়া “গুরুচ্ছাদি” তৈলমর্দ্দন করিতেন। সে তৈলের কি-এক বিট্‌কেল গন্ধ! তাঁহার এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন। নিয়মিত তৈলনর্দ্দনে বেত গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্র-বাৎসল্য ছিল। একবার ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয় ঠিক যেন বৎসহারা গাভীর মত শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফিরিয়া পাইয়া, তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডূয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার, জগতে যেন তিনি নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতি-বাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী।

হেমেন্দ্রনাথ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও

সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই আপন মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—এবং তাহাতে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুভার মুদ্গর অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া, এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই অযথা রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বাল্যকালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কূলে ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা না হউক

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত ?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ ॥

সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই আপন মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—এবং তাহাতে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুভার মুদ্গর অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া, এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই অযথা রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বাল্যকালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা না হউক

দালানের রোয়াক দিয়া আসরে নামিত, তখন ছেলেরা সত্যসত্যই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিত—কেহ কেহ তারস্বরে ক্রন্দনই জুড়িয়া দিত।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন, "বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া একত্রে আগে শান্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্নে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বুকটা বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত। প্রথম-প্রথম কয়েক দিন খুবই কষ্ট-বোধ হইত।

"এই দুর্গোৎসবে—দেব, মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্যই দেখা যাইত। বিজয়ার দিন, সকল শত্রুতা ভুলিয়া বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন, গুরুজন বলিয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ এবং কণিষ্ঠদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদের যে ধূম পড়িয়া যাইত—তাহাতে আমার মনে হয়, এ যেন একটা স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা। মানব ভাব,—যেমন কোন আত্মীয়ার আগমনে হর্ষ এবং বিদায়কালে অশ্রুপাত। দেবীকে "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া,ভক্তিগদ্‌গদ-চিত্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতি জন্মিত, তাহা কথায় বলা যায় না। আবার সেই দেবীর বিসর্জ্জনে মানব-হৃদয় বিয়োগ-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া সত্যসত্যই অশ্রুবন্যায় গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। এইরূপে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কোমলতা বিকশিত হইত। অপর দিকে, চালচিত্রঅঙ্কনে ও প্রতিমানির্ম্মাণে চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যারও একটা উন্নতি এদেশে বহুকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণনগরের কুমোর-পটুয়াদের এ বিষয়ে এত উৎকর্ষ-লাভের ইহাই একটা প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই উৎসবে

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্ত বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ॥

৺গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণ-দাদাতেও (তাঁর পুত্র ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েও) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোটকাকামহাশয় (৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়াও অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য শেষে তিনি নিজেই বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোটকাকামহাশয়ই দেশীয় লোকের মধ্যে এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্‌ চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার জন্য সদর রাস্তা ও আমাদের গলিতে একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্‌ চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর

(মহর্ষির) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বৰ্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বৰ্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বৰ্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজের কাযকৰ্ম্ম বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বৰ্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।”

৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৈশোর-স্মৃতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা এবং মাষ্টারমহাশয়ের নিকট একটু ইংরাজী পড়িয়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Academy, তার পর হিন্দুস্কুল। এইরূপ ঘনঘন স্কুলপরিবর্ত্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা তিনিও ভাল বলিতে পারেন না, অভিভাবকেরাই জানিতেন। পূর্ব্বকথিত, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের ফলে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কেমন একটা বিতৃষ্ণাই জন্মিয়া গিয়াছিল; কাযেই স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মনোযোগ দিতে পারিতেন না।

ছেলেবেলাকার একটা কথা তাঁহার মনে পড়ে, তাহাতে বেশ একটু মজা আছে। উপনয়নের সময় অন্তঃপুরে একটা ঘরের মধ্যে যথারীতি তিন দিন তিনি বদ্ধ হইয়া আছেন। একদিন হঠাৎ ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন "হনুমান" "হনুমান"! এবং উক্ত ভক্ত-বীরের বিদায়-সঙ্গীতের ঐক্যতানে দাসদাসীদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কিছুই নয়—একটা হনুমান্ ছাদের প্রাচীরের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। এমন একটা অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য জীব-দর্শনের লোভ অতিক্রম করা অশূদ্রস্পশ্য বালকব্রহ্মচারীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারী দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া পড়িয়া, এক লাফে একবারে নিষিদ্ধদর্শন শূদ্রদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হনুমান ছাড়িয়া অন্তঃ-পুরিকাদের মধ্যে তখন আবার এক নূতন সোরগোল পড়িয়া গেল। তাড়া খাইয়া তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় ম্লানমুখে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো, যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (অধুনা লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র —তখন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাহার উপর, তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। সে সকল চিত্র চোঁত্রা কাগজেই অঙ্কিত হইত, সেগুলিকে রক্ষা করার কথা তখন কাহারও মনে

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ দুঃখিত—সে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তবুও চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুব্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত দুইখানি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক যেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কখন'-কখন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তো

এ কার্য্য কে করিয়াছে। সকলেই অস্বীকার করিল, কিন্তু জ্যোতিবাবু, যে করিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দিলেন। এ জন্য জ্যোতিবাবুকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ছাত্রেরা তাঁহার বই লইয়া এরূপভাবে লুকাইয়া রাখিত যে, অনেক সময় সে বই আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। পুস্তক অভাবে অনেকদিন পড়া না বলিতে পারায়, মাষ্টারদের নিকট তিরস্কৃত এবং এত ঘন ঘন বই হারান'র জন্য বাড়ীতে অভিভাবকগণের নিকটও তাঁহাকে ভর্ৎসিত হইতে হইত। এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী নির্য্যাতন তিনি পূর্ব্বে যে কিছুই অনুমান করেন নাই, তাহা নয়; তবুও বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাদের উচ্চ বংশ-গৌরবকে খর্ব্ব করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে হিন্দু স্কূল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিত। কারণ কিছুই নহে, বালসুলভ চাপল্যমাত্র। তখনকার দিনে এ এক প্রকার ফ্যাশানের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। কখন-কখন এই দুই দলের লড়াইয়ে রক্তারক্তি ও মাথাফাটাফাটি পর্য্যন্ত হইত। হিন্দুস্কূলের ইংরাজ হেডমাষ্টারের নিকট নালিশ আসিলে, তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দান্ত ছাত্রদের কথাই তাঁহার মনে পড়িত!

মধ্যে হিন্দু স্কূল একবার শ্যাম মল্লিকদের জোড়াসাঁকোর থামওয়ালা বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে একদিন টিফিনের ছুটিতে জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে একটা লোককে স্কূলের হাতার ভিতর হইতে জনৈক কনেষ্টবল থানায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—সে নাকি কি একটা অপরাধ করিয়াছে, তাই তাহাকে গেপ্তার করিতে কনেষ্টবলটি স্কুলঘর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। জ্যোতিবাবু-

কনেষ্টবল মহাশয় যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সকলে মিলিয়া নিকটস্থ ইঁটের একটা ঢিবি হইতে ইট লইয়া কনেষ্টবলটির দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। শেষে পুলিশের সিপাহী মহাশয় এমনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন মুলতুবী রাখিয়াই সবেগে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন—আর এই ফাঁকে সে লোকটাও বেমালুম কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

জ্যোতিবাবু একবার তাঁহার মেজ্‌দাদা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেও তাঁহার একটি সুখের স্মৃতি। তখন মিষ্টার ঘোষের পিতা মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন করিতেন,তিনি বলেন,তাহা কখনও ভুলিবার নহে। তখন ঘোষ-পরিবারের মধ্যে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, অন্তঃপুরে তাঁহাদের অবাধগতি ছিল। মিসেস্ ঘোষ তখন বালিকা বধূ। বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার সঙ্গে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাস খেলিতেন। মনোমোহনবাবুর পিতা লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ রামলোচনবাবু যেরূপ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এবং তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া “অ—ম—ন্—ম—হ—ন্” বলিয়া ডাক দিতেন, তাহা কখনই ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয়, কৃষ্ণনগরের দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ফুর্‌ফুরে সেই “[illegible]” [illegible] এবং তাঁহাদের বাড়ীর চা! সে চা'য়ে কি সুগন্ধ! এমন চা, জ্যোতিবাবু বলিলেন, আর কখনও তিনি খান নাই। আসল কথা, ছেলেবেলাকার সকল অনুভূতিই একটু বেশী মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে। তিনি লালমোহনবাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন।

একদিন তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দীর্ঘ তরুবীথির মধ্যে মনোমোহন-বাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু দুইজনে পায়চারী করিতে করিতে বিলাত যাইবার

মৎলব আঁটিতেছিলেন—লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the Steamer is ready !"

তখন কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশববাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! আজ লালবিহারীবাবু কেশববাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দিবেন! আজ কেশববাবু আবার সেই প্রতিবাদের উত্তর দিবেন! এই রূপ প্রায়ই কিছু না কিছু একটা হৈ চৈ থাকিতই। উভয় পক্ষই বাগ্‌-যুদ্ধে বিশেষ মজ্‌বুত ছিলেন। লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশব-বাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ-প্রয়োগে কেশববাবুও বড় কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশববাবুর মৌখিক, সুতরাং সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার তোড়ে রেভারেণ্ড লালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা-মস্করা কোথায় ভাসিয়া যাইত। কেশববাবুর দলই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিত! তাঁহারা ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে খুব মাতিয়া উঠিতেন আর চিৎকার করিয়া কেশববাবুর জয় ঘোষণা করিতেন।

এই সময়ে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রাহ্মোৎসবের খুব ঘটা হইত। সমস্ত বাড়ী পুষ্পমালায় ভূষিত হইত। প্রত্যূষে যখন রশুন্‌চৌকিতে প্রভাতী বাজিয়া উঠিত তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইত তাহা তিনি কথায় বর্ণনা করিতে পারেন না। আদিব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপ্ত হইয়া গেলে, দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। টেবিলের উপর বড় বড় দরবেশী মিঠাই ও কমলা
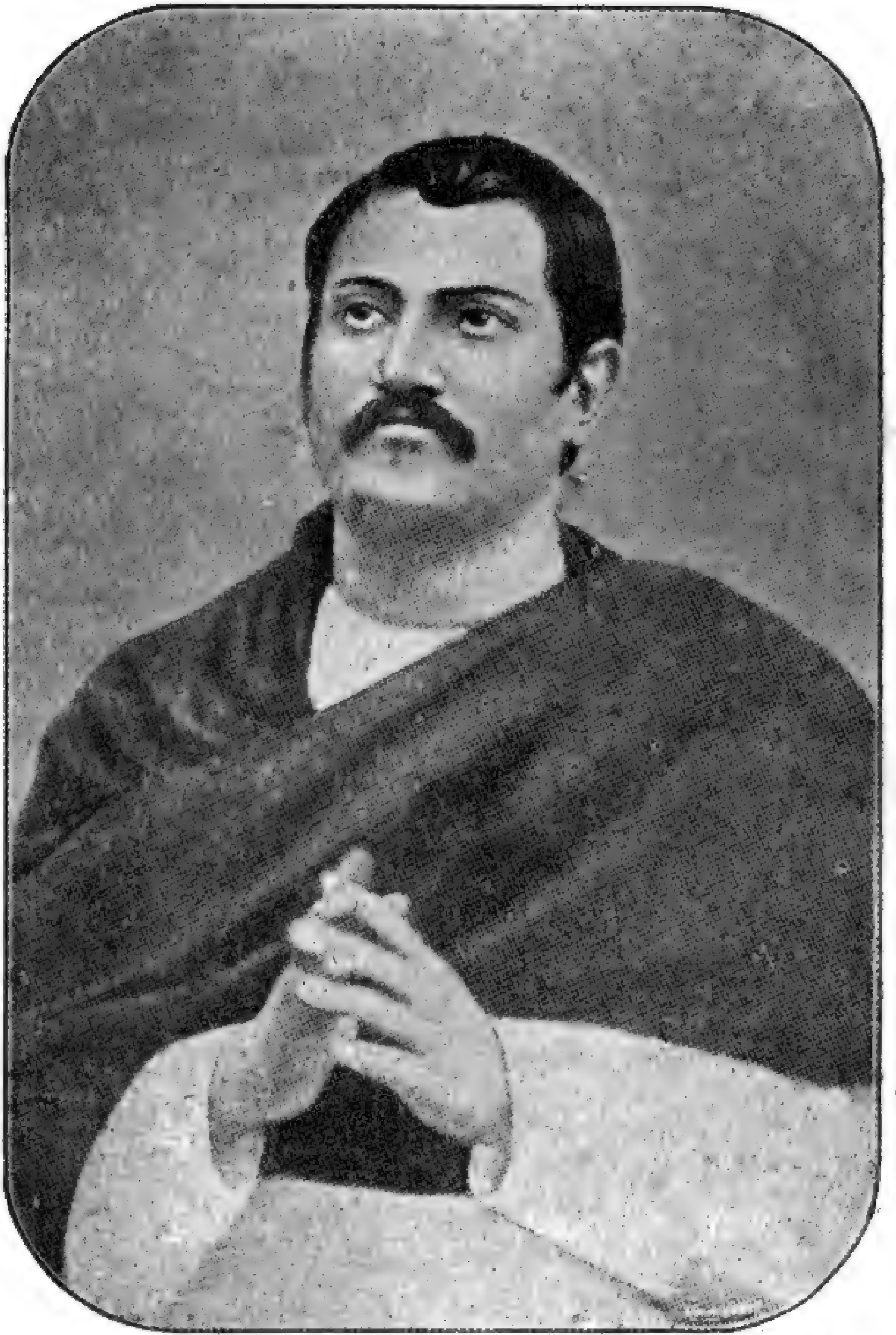
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

লেবুর পিরামিড সাজান' থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে"র একজন: প্রচারক ও যিনি "Unity and Minister" কাগজের সম্পাদক ছিলেন—সম্প্রতি তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে—ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তফলকে এখনও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও", "আজ আনন্দের সীমা কি", "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সর্ব্বশেষে হরদেব চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের দুর্গাপূজার সেই আনন্দ এবং এ-কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ, এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ! এ এক ছবি, আর সে এক ছবি।"

এই খানে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়ও প্রদত্ত হইল। "উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি ইংরাজী-শিক্ষা একেবারেই পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও একটু ফার্শী জানিতেন মাত্র। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন-স্কুল খোলা হয়, ইনিই সর্ব্বাগ্রে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার দুইটি কন্যাকে বেথুন-স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী। ইঁহার গোঁপ-দাড়ি কামানো, মস্তক মুণ্ডিত এবং মাথায় একটি

শিখা ছিল। ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয়খানি সদাসর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ছিল। মুখটি নিয়ত প্রফুল্ল। পরিধানে গৈরিক বসন। একটা ঔষধের কৌটা অনবরত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। তিনি দীন-দুঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাহিতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন; যথা—

"ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
কলম্বস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।"
ইত্যাদি।

ইঁহার রচিত গানগুলি শেষে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় নিজব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। তিনি যে কি সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমি সঠিক জানি না। ইঁহারই উক্ত দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর ৺হেমেন্দ্রনাথের এবং বীরেন্দ্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন'দাদার) সহিত বিবাহ হয়।"

সেকালের কলিকাতা—

গৃহ ও সমাজ-স্মৃতি

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত। যেখানে এক সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।

শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া, জ্যোতিবাবুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া, অক্ষয়চন্দ্র প্রত্যূষভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে শীতকালেই সকলে প্রাতর্ভ্রমণ (morning walk) করিত। বেশ করিয়া শীতবস্ত্র চাপাইয়া ও গলায় কম্ফর্টার (comforter) জড়াইয়া, ৩।৪টা রাত্রে তাঁহারা দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইতেন;

এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইঁহারা ফিরিতেছেন, কেশববাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার হাঁক দিয়া (challenge করিয়া), বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ধনী ও গরীব লোকেদের মধ্যে গরম কাপড়ের তখন তেমন বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প পয়সার লোকেরা শীতকালে দোলাই ব্যবহার করিত। এখন যেমন সস্তা বিলাতী শাল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন তাহা ছিল না। ধনীরা শীতকালে শাল দোশালা জামিয়ার রেজাই প্রভৃতি ব্যবহার করিত। এখন যেমন রেশ্মী চাদরের ফ্যাসান হইয়াছে (বোধ হয় সস্তা বলিয়া) তখন তাহা ছিল না।"

পথে বাহির হইয়া কে কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে আমরা নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তাহাতে পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই এক খেলা হইল—যে, কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, সেদিন তাহারই জিত হইত!

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই

.শে প্রচলিত হয় নি। সে চায়ের কি সুগন্ধ! আমাদের .কক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দ্দার ছিল। সকলের .পয়ালায় যে চা-টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া, চক্ষু খুব আরাম করিয়া সে প্রতিদিনই সেইটুকু খাইত। তখন বাহির । হিন্দুস্থানী দারোয়ান্ ও অন্দরে বাঙ্গালী সর্দ্দার দিবারাত্র পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিত।

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত থাকিতেন—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। গুরুতর রোগ না হইলে সাহেব-ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব-ডাক্তারের উপর তখন সকলেরই অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্পবেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্রাদি দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। ইনি অনেকটা শুশ্রূষাকারিণী নার্সের মত। আমাদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই শেষোক্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিত। তাঁহার বগলে নিয়তই কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত। তাহার খোপে খোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচ্ড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ নানা রঙ-বেরঙের মলম রাখিতেন।"

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ ॥

স্বর্গীয় ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত—(ডি. গুপ্ত)

সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই আপন মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—এবং তাহাতে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। হীরা সিং নামক একজন পাঞ্জাবী উভয়েরই ওস্তাদ ছিল। তলোয়ার গৎকা কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম-ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুভার মুদ্গর অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ান্‌ও উঠাইতে পারিত না।

ছেলেবেলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পায়ে "কাউর ঘা" ছিল। কত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, কিছুতেই সারে নাই। পরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে ঘা আপনিই সারিয়া যায়। অনেক সময় রোগ অপেক্ষা ঔষধই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইত। যে যাহা বলিত, ঘায়ে তাহাই লাগান' হইত। একদিন একজন হিন্দুস্থানী বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে এই ঘায়ে ব্রাণ্ডি দিয়া, এক কড়াই গম্‌গমে আগুনের উপর পা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; সে কি যন্ত্রণা! এই অযথা রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে যাহার যাহা নাই, সেই দিকে তাহার মনের ঝোঁক হয়। বাল্যকালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া বেশী বয়সে অশ্বারোহণ শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে যে তাঁহার মন গিয়াছিল, তিনি বলেন—অনেকটা এই কারণে।

বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা না হউক

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ॥

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো, যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (অধুনা লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র —তখন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাহার উপর, তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। সে সকল চিত্র চোঁত্রা কাগজেই অঙ্কিত হইত, সেগুলিকে রক্ষা করার কথা তখন কাহারও মনে

রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। কাযেই হিন্দু মুসলমানী এবং ইংরাজী এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে, এবং যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে। এ সন্ধির ভাবটা এখন আমাদের সব কাযেই প্রকাশিত হইতেছে। যেমন হিন্দুমতে পূর্ব্বে নামের আগে "শ্রীযুক্ত" লেখা হইত; মুসলমান-আমলে আসিলেন "বাবু"। যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপ সম্মান দেখাইতে হইত, তখন তাঁহাকে লেখা হইত "শ্রীযুক্ত বাবু" তার পর ইংরাজী মতে আসিল "Mr." এবং "Esquire"। শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esqr.ই প্রযুক্ত হয়। হিন্দু "শ্রীযুক্ত" এবং মুসলমান "বাবু" বেশ একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া "শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুক চন্দ্র অমুক এস্কোয়ার" হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়াই "বাবু"কে অত্যন্ত অনাদর অবহেলা ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই "বাবু" অভিমানে এখন গা-ঢাকা দিয়াছেন; বাবু অন্তর্হিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশ ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে। এখন ভাল ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক্-শুক্তানী, মোগলাই মতে কালিয়া-পোলাও, এবং ইংরাজী মতে চপ্ কাট্‌লেট্‌এর আয়োজন করিতে হয়। পোষাকেও তাই—ধুতি, চাদর, চাপকান এবং মোজা ক'লার (Collar)। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষারও তাই—সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী, আর্‌বী এবং ইংরাজী সকলেই বাঙালীর ভাষায় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার
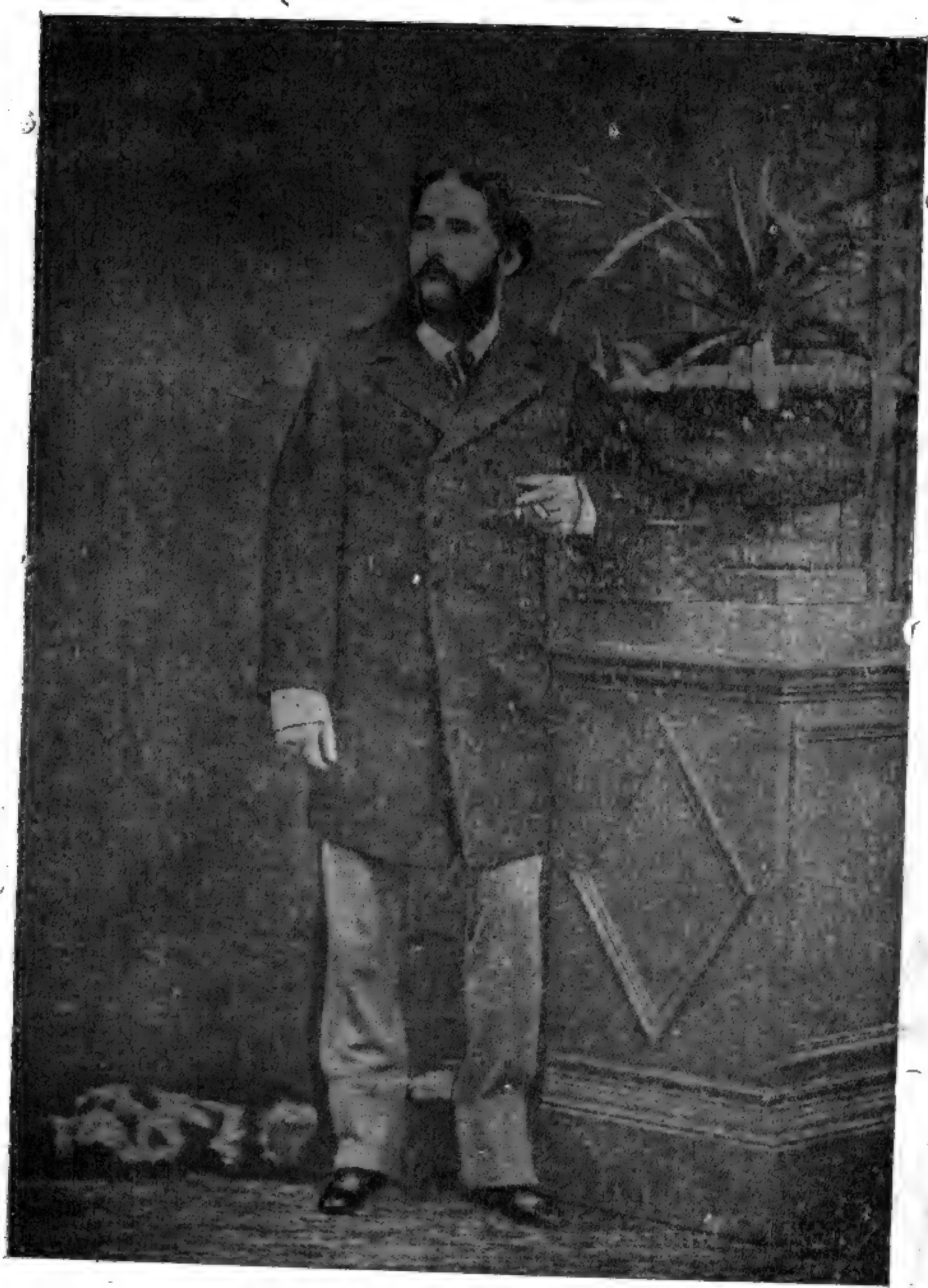
কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টী বড় বড়, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা'-ভাঙা'। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

"মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া

তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copy right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেখেলা,
নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেযো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র —গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ।

"একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর

বৈঠকখানায় মহাউৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

> "ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
> বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
> ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
> হাসবে লোকে, হাস্‌বে লোকে—
> হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!—"

হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হাঃ হাঃ হাঃ" সুরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্য হইত আর ধূপধাপ্ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই শান্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—'এসোনা, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি।' অমনি গুণুদাদার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীরখেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল, আমাদের

গুণুদাদার খুব ভাল লাগিল। এ প্রস্তাবটি তিনি আন্তরিক অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম—এখনি ইহার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক্। দেশী masonic দলের কিরূপ পরিচ্ছদ হইবে, প্রথমে ইহাই হইল আমাদের প্রধান সমস্যা। যাহা হউক, অনেক প্রকার যুক্তিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া একটা পোষাক স্থির হইল। দর্জী আসিল, কিরূপ কাপড় ব্যবহৃত হইবে, তখনই তাহার পরামর্শ বসিয়া গেল।

"ও-বাড়ীর সংলগ্ন একটা ছোট বাড়ী আমাদের নূতন কেনা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে Free mason-এর আড্ডা বসিল। Free mason সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই ছিল না। এ সভায় আমাদের যে কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহারও কিছুই স্থির নাই। এই মাত্র জানিতাম যে, আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে সমস্তই গোপনে করিতে হইবে। একটা "প্রতিজ্ঞা-পত্র" লিপিবদ্ধ হইল। তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ :—এখানে আমরা যাহা শুনিব, যাহা দেখিব বা যাহা করিব, তাহার বিন্দুমাত্রও বাহিরে কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না—প্রাণান্তেও না। সে যেন হইল, কিন্তু ঘরের পরিচারক ভৃত্য বুদ্ধু বেহারার সম্বন্ধে কি করা যাইবে? স্থির হইল, আমাদের অন্যতম mason ভ্রাতা অক্ষয়বাবু (প্রসিদ্ধ "কমিক" অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার)—হিন্দিভাষায় বুদ্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অমনি বুদ্ধুকে বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখো বুদ্ধু, হিঁয়া তোম্ যো কুছ্ দেখো গে, কভি কিসিকো নেই বোল্না —আচ্ছা?" ইত্যাদি। বুদ্ধু একথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিয়া উঠিল—"হম্ কেন বল্‌বে মশাই?" সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলিয়াই সে ঘরের ঝাড়পোঁচ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইল।

ক্রিমেশানি পালার এইখানেই ইতি হইল। সৌভাগ্য ক্রমে আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।”

এইখানে জ্যোতিবাবু, গুণেন্দ্রনাথের দয়া ও আশ্রিত-বাৎসল্যের একটা গল্প বলিলেন। “আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ঋণগ্রস্ত হইয়া গুণুদাদার বাড়ীতে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন। পাওনাদার তাঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবার সুযোগ পাইত না। জনৈক গৃহশত্রু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। গুণুদাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের এ-বাড়ীতে আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং এই বিপদের কথা জানাইলেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ—এত রাত্রে—অত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? আমার তখন হাটখোলায় পাটের আড়ৎ ছিল—লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তখনি টাকা আনাইলাম—তিনি সেই টাকায় ঋণ-পরিশোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলেন।”

মধ্যে একবার জোড়াসাঁকো-বাড়ীর আগাগোড়া মেরামৎ ও জীর্ণ-সংস্কার করিবার প্রয়োজন হয়। সেই উপলক্ষ্যে নৈনানে শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল মহাশয়ের বাগান বাড়ীটি ভাড়া লইয়া, বাড়ীশুদ্ধ সকলে কিছুদিন সেখানে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটি খুব বড়, দোতালা, বাড়ীর হাতাও ছিল খুব বিস্তৃত। হাতার মধ্যেই খানিক দূরে রান্না-বাড়ী। রান্না-বাড়ীটি বড় বড় গাছে ঘেরা, তাহার সামনে ঘাট-বাঁধান’ একটা পুষ্করিণী। চাকরেরা রাত্রি ১১টা ১২টার সময় রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়া যদি যায় তো,অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শেষে এমন হইল যে, একদিন একটা চাকর, অত্যধিক ভয়ে মরিয়াই গেল। কিনু নামে একজন বৃদ্ধ হর্‌করা ছিল। জ্যোতি বাবু কিনুকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—“দাওয়ানজীর (মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়) মত চেহারা, মাথায় তাঁরই

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এইবার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তনপান করে, এবং দিন-রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্ছাটিকে লইতে গেলে রূপী একবারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন খায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে তড়িতাহতের ন্যায় উচ্চকিত হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে ফিরিয়াছে। হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

শান্তিধামের দর্শকসংখ্যাও বড় কম নয়! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা ও অপরাহ্ণে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের বিষম ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে

গোল মিটে যায়। যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্‌চ?" এই বাক্যে ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা অনুসারে "তুমি কি বল্‌চ?" বা "তুমি কি-বল্‌চ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেখানে "সদৃশ"—সেখানেও আবশ্যক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই!"

"যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্নপ্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফার্‌সী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না, তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাযেই অর্থ না বুঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আমাদের ভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য আমি V লিখতে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লিখি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হ্ব" অনেকটা Vর মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস না লিখিয়া "হ্বিনাস" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষরনির্ব্বাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গিয়া বিজয় বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয় বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান।...তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয়

৺মনোমোহন ঘোষ—(পঠদ্দশায়)

সংবাদপত্র বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন। তখন হইতেই তিনি চমৎকার ইংরাজি লিখিতে পারিতেন। এই সময়ে Captain Palmer নামক একজন সুলেখক ইংরাজ জুটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া ইণ্ডিয়ান মিরারে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। দোষের মধ্যে লোকটি বড় মাতাল ছিলেন। যাহা কিছু পাইতেন, সমস্তই মদে উড়াইয়া দিতেন। আমার বেশ মনে আছে, পামার সাহেব একদিন মদের পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্য খুব অল্প দামে, মাথায় দূর্‌বীণ্ বসানো একগাছি ভাল ছড়ি সেজদাদাকে বিক্রয় করিয়া ছিলেন।”

পাঠ-শেষ

নানা স্কুল-পরিবর্ত্তন করিয়া, শেষে হিন্দুস্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশববাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব-বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই 'Calcutta College নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক্, এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় W. C. Bonnerjee মহাশয়ের পিতৃব্য), স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি অনেকেই এই স্কুলে শিক্ষকতা করি-তেন। কেশববাবু কেবল নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানা-রূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষ আঁকিয়া ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি, মানুষের নানাপ্রকার কর্ত্তব্যবিভাগ বুঝাইয়া দিতেন; আর নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানা-বিধ বক্তৃতাও দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইত।

ক্লাস বসিবার আগে, সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন, তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেন:—

Our father, which art in Heaven

Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil; for Thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever.

Amen,

বঙ্গানুবাদ—হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হউক্। তোমার রাজ্য প্রবর্ত্তিত হউক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হউক। আমাদিগকে আজ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দাও। আর, আমরা যেমন আপন আপন অপরাধী-দিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তেমনি তুমিও আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে প্রলোভনের দিকে লইয়া যাইও না, আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর। যেহেতু রাজ্য, শক্তি, এবং মহিমা নিত্যকাল তোমারই। আমেন্।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় 'ওঁ পিতা নোঽসি' মন্ত্রটির* সহিত এই Lord's Prayerএর একটু মিল আছে; কিন্তু আমাদের

* "ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

বঙ্গানুবাদ—তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। আমাকে

বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টী বড় বড়, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা'-ভাঙা'। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া

একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল, যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি তো শুনিয়া অবাক্, বিশ্বাসই করিলেন না। কিন্তু শেষে জানিলেন যে, সত্য সত্যই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ তখন পড়িতেন, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটগাঁয়ের ফিরিঙ্গি, সেই জন্য তাঁহার ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বটা ছিল ততোধিক। কোনও একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়াই তিনি বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহই করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরিওয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে তাঁহার ভাগ্যই বলিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, "This man has brains".

তিনি মদে চুর হইয়া ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার মুখের কাছে অনবরত মাছি ভন্‌ভন্ করিত, আর তিনি ক্রমাগত হাত দিয়া তাড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই, তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন, কিন্তু সহুরে ছাত্রকে বড় কিছু বলিতেন না।

গোল মিটে যায়। যেমন মনে কর—"তুমি কি বল্‌চ?" এই বাক্যে ঝোঁকের বা অর্থের ভিন্নতা অনুসারে "তুমি কি বল্‌চ?" বা "তুমি কি-বল্‌চ?"—এইরূপ লেখা যাইতে পারে। প্রথম স্থলে, "তুমির" উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় স্থলে "কি-র" উপর ঝোঁক।

"মত" শব্দের অর্থ যেখানে "সদৃশ"—সেখানেও আবশ্যক হইলে এইরূপ হাইফেন প্রয়োগে অর্থ স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যথা "তোমার-মত লোক নাই!"

"যাই হোক্, কোন বিশেষ চিহ্নপ্রয়োগে যদি ভাষার অস্পষ্টতা দূর হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে, আরবী ও ফারশী ভাষাও এই হিসাবে অসম্পূর্ণ। কেন না, তাহাতে এক বানানের অনেকরূপ পাঠ হয়, কাযেই অর্থ না বুঝিয়া পড়া যায় না। এ সমস্ত যে ভাষার অভাব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আমাদের ভাষায় V উচ্চারণের মত বর্ণ নাই, এইজন্য আমি V লিখতে "ভ" না লিখে মারাঠী নিয়মে "হ্ব" লিখি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, "আহ্বানে" "হ্ব" অনেকটা Vর মত, এই জন্য Venus লিখিতে তিনি "ভিনাস না লিখিয়া "হ্বিনাস" লেখেন।

যোগেশবাবুর যুক্তাক্ষরনির্ব্বাসনসজ্জা দেখিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এ কেবল শক্তির অপব্যবহার ও পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।"

তাহার পর আমাদিগকে লইয়া তিনি ছাদের উপর গিয়া বিজয় বাবুর (মজুমদার) কথা পাড়িলেন। বিজয় বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিজয় বাবুর চমৎকার ছন্দজ্ঞান।...তিনি যে একজন গ্রন্থকীট তাহা তাঁহার লেখা পড়িলেই বুঝা যায়।" বিজয়বাবুর বিষয়

৺মনোমোহন ঘোষ—ব্যারিষ্টার

বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। Second Yearও প্রায় যায়-যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া, কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া, এই খানে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া, তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য-জরার বজ্রমুষ্টিকে অবহেলা করিয়া, আজিও ফরাসী ভাষা হইতে নিত্য নূতন অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষারম্ভ হইল, এই কাশীপুর উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত "সীজার" (Cæsar) নাটক তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন অহরহ ধ্বনিত হইতেছে :—

"Cæsar tu vas regnier"—সীজার তু ভা রেঙিয়ে ; অর্থাৎ —সীজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

এইখানে অবস্থানকালে, অবকাশ সময়ে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ-বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, বোম্বায়ের প্রতি তিনি ক্রমশঃ

সংকল্প করিলেন। পরীক্ষা দিবেন না, কাযেই ফীও দাখিল করা হইল না। বোম্বাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিত মহাশয় (স্যর টি পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধরণে থান্ ধুতি পরিতেন, এবং আপাদ-লম্বিত একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইতেন। সে পরিচ্ছদে বেশ একটা অপূর্ব্ব শোভা এবং মধুর গাম্ভীর্য্য ছিল। আর এই বেশে তাঁহাকে হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত রোমক সেনেটার বলিয়া ভ্রম হইত। এইবার হয়ত পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে আশঙ্কা করিয়া, স্যর পালিতকে দেখিবামাত্রই জ্যোতিবাবু বিষম ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পালিত মহাশয় জ্যোতিবাবুকে বরাবর ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করিতেন—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত মৎলব শুনিয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন, "সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি Sutcliff কে বলিয়া, তোমার ফী জমা করাইয়া দিব। তুমি শুধু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।" জ্যোতি-বাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। তিনি পরীক্ষা না দিয়াই, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই পলায়ন করিলেন।

বোম্বাই-গমন, সঙ্গীত-শিক্ষা এবং নাট্যসাহিত্যের সংস্কার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদ্যালয় ছাড়িলেন, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িলেন না ; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। বোম্বাই গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি ভাল ভাল ইংরাজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিয়া ফেলিলেন, এবং অধিকাংশ সময় ঐ সমস্ত পুস্তকপাঠেই নিযুক্ত থাকিতেন। এখানে অবস্থান কালে, তিনি আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সেটি সেতার-বাদ্য। একজন গুজ্‌রাটী মুসলমান তাঁহাকে প্রত্যহ সেতার শিখাইত। ক্রমশঃ ওস্তাদজীর জানা সমস্ত গৎই অভ্যাস করিয়া লইয়া, অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি গুরুর সমস্ত পুঁজিপাটা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। যাহাই হউক, এই ওস্তাদের কাছেই সর্ব্বপ্রথম তিনি সেতারে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার বাজনা শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বিশেষত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার সেতার বাজনায় এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি জ্যোতিবাবুকে (ostrich) সাম্রোক্‌-পক্ষীর ডিমের তুম্বে একটি সুন্দর সেতার তৈরি করাইয়া, তাঁহাকে সস্নেহে উপহার দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু এই সেতারটি তাঁহাদের বাড়ীর একটা আল্‌মারির উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, বহু দিন সেটি ছিল, কিন্তু কি করিয়া পড়িয়া গিয়া পরে সেটি ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি বলিলেন, অভ্যাসের অভাবে এক্ষণে তাঁহার সেতারের হাত আর আদপেই নাই।

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এই যন্ত্রটি বাজাইতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যখন

ছাড়িয়া দিলেন, তখন হার্ম্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তখন ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এখন এত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপযুক্ত নই।"

ব্রাহ্মসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদাই একখানি নোট্‌বুক্ থাকিত ; যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্‌বুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্ম্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্নোত্তরের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লইলেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তখনি এক পেয়ালা করিয়া চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে

তবু এমনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে,জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও নূতন কিছু দেখিলেই তিনি প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না,এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন, তখনি পকেট হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া রাখিতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন,বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া, নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে দেখা হইলেই, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ-স্থাপনের জন্য কত যে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical Collegeএর Record খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে।"

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, সমাজে বিষ্ণু-বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারেঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগ-রাগিণী ঠিকমত বাজান' যে একরূপ অসম্ভব—ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন।

"মান্নার একটা অদ্ভুত সখ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত গায়ে সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব যেমন তেমন নয়—কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে, সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সর্পাঘাতেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।"

জ্যোতিবাবু আরও বলিলেন—

দুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কখনও দেখি নাই—আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে, বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান-অলঙ্কারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-স্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাহিতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ ৺সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।”

তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্ দাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) এই তিনজনে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষি তাঁহাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন।

তখন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে:—“রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত’ ছিলেনই,

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ দুঃখিত—সে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তবুও চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুব্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত দুইখানি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক যেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কথন'-কথন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তো

বাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্য-সমিতির সভ্য হইলেন।

কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। জ্যোতিবাবু পূর্ব্বে যখন কেশববাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তখন হইতেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"কৃষ্ণবিহারী ইতিপূর্ব্বে "বিধবা-বিবাহ" নাটকে পড়ুয়ার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই এই বিষয়ে তাঁহার একটু অভিজ্ঞতা থাকায়, আমরা তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিতাম। তিনিই আমাদের অভিনয়-শিক্ষক হইলেন।"

প্রথমেই মহাকবি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনীত হইল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। সকলেই অভিনেতা ও অভিনয়-পারিপাট্যের একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল।

নীচের ঘরে অহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় "পঞ্চজনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদানুবাদ, কিছু-না-কিছুর একটা গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাস্যকলরবে ও গানবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বাম্যাচরণ বলিয়া একজন যাত্রাদলের ছোক্‌রা আসিয়া, নাচগানে তাঁহাদের আমোদ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিত।

তাঁহাদের একটা "Eating Club" ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া একএকজনের খাওয়াইতে হইত। সে ভোজের তেমন বেশী

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এই যন্ত্রটি বাজাইতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যখন

৺কৃষ্ণবিহারী সেন

হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কৃষ্ণবিহারীবাবুর ছোট কথা পছন্দ হইত না বলিয়া, তিনি বিচারকের ইংরাজীতে নাম দিলেন "Adjudicator !"

অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একখানিও পুরস্কার-প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া, Committee of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর এই রচনার ভার অর্পণ করাই সমধিক সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা-লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই সময়ে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেনঃ—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম (National Dramatist) জাতীয় নাট্যকার বলা যাইতে পারে।"

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন যাহাতে আর ছেলে-মানুষী অথবা কোনরূপ "ধাষ্টামো" না হয়, সেজন্য তাঁহারাই এবার এ কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিস্কৃতি পাইলেন, তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন।

নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম "নবনাটক"। যেদিন

এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল, এবং সভাস্থলে নাটক খানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" বিদেশী আদর্শের একটু গন্ধ যে একেবারে না ছিল তাহাও নহে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তিনি ইংরাজি শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই, খাঁটি বাঙ্গালায় এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

"এখন হইতে "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (Scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় "চিত্ততোষ", আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

৺রামনারায়ণ তর্করত্ন

একদিন তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জানাইল, যে তিনি পাশ হইয়াছেন। তিনি তো শুনিয়া অবাক্, বিশ্বাসই করিলেন না। কিন্তু শেষে জানিলেন যে, সত্য সত্যই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ তখন পড়িতেন, বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটগাঁয়ের ফিরিঙ্গি, সেই জন্য তাঁহার ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বটা ছিল ততোধিক। কোনও একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়াই তিনি বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহই করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরিওয়ালা Sutcliff সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না—কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে তাঁহার ভাগ্যই বলিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন, "This man has brains".

তিনি মদে চুর হইয়া ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার মুখের কাছে অনবরত মাছি ভন্‌ভন্ করিত, আর তিনি ক্রমাগত হাত দিয়া তাড়াইতেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের ছাত্র দেখিলেই, তাহাকে নাকাল করিয়া ছাড়িতেন, কিন্তু সহুরে ছাত্রকে বড় কিছু বলিতেন না।

কবিবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আমাদের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

"অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্র-লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পা-দিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যি-কারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারি-শ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।

"অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কখন বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত, কখন বা অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত দেখিয়া, আমাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইত। যখন গবেশবাবুর ছোটগিন্নি ও বড়গিন্নি, গবেশবাবুর এক-একটা পা দখল করিয়া তৈলমর্দ্দন করিবার জন্য টানাটানি করিত, আর বলিত—"এটা আমার পা, তুই আমার পা-টায় কেন তেল মাখাচ্ছিস" ইত্যাদি, তখন গবেশবাবুর অবস্থা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া দর্শকেরা কেবল হাসিয়া

৺নীলকমল মুখোপাধ্যায়

ও
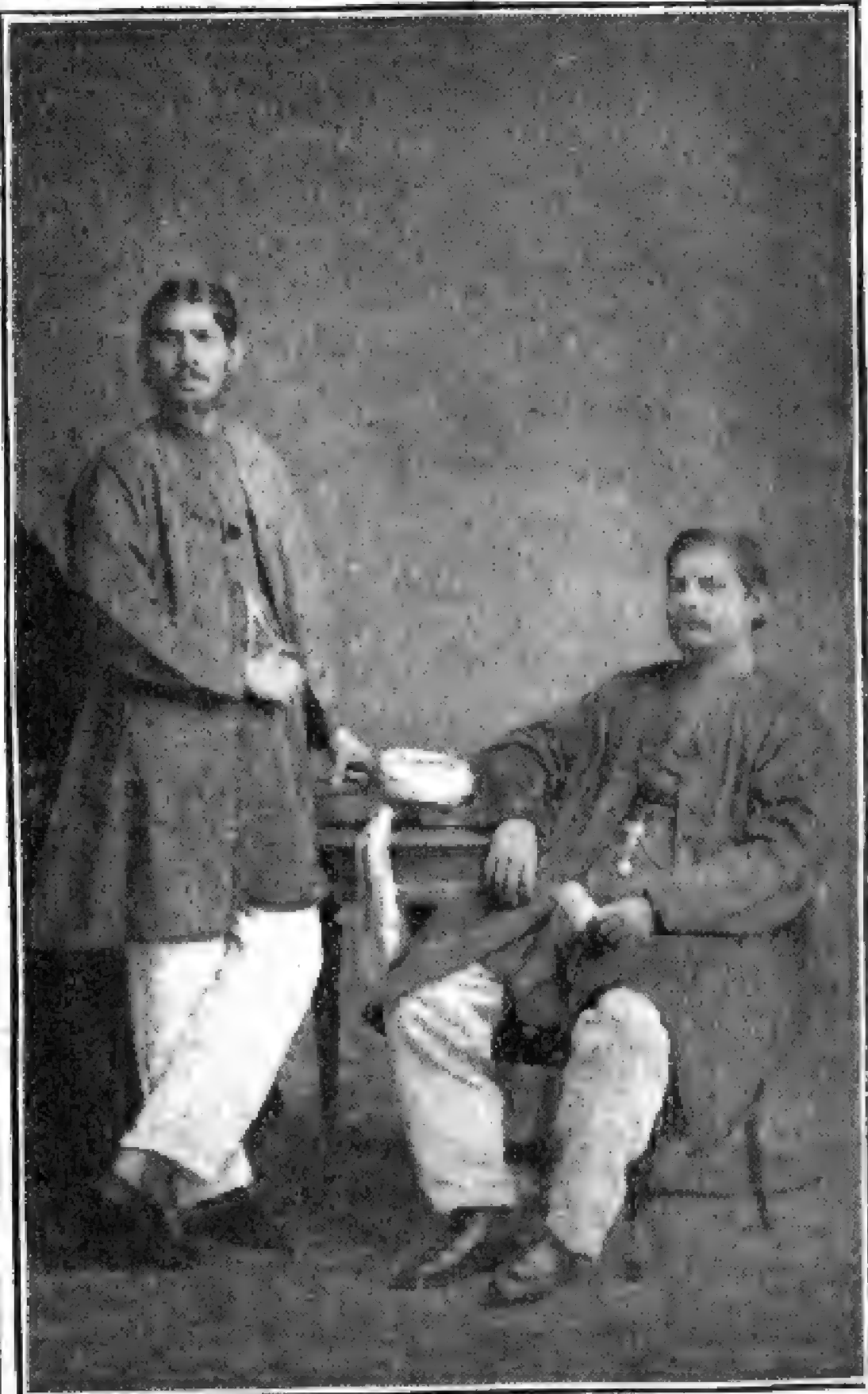
৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

অনেকেই এখন ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র আমিই এখনও সশরীরে বর্ত্তমান আছি।

"আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সম্মুখে বসিয়া প্রসাধন করিতেন, ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রূপসীর হাবভাবের অভিনয় করিতেন, তখন সে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আমাদের আরও দুইজন (tragic actor) করুণ-রসের অভিনেতা ছিলেন। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যখন সুবোধের ভূমিকায়, সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া, নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন, এবং যখন ৺সারদাপ্রসাদ বড়স্ত্রীর ভূমিকায় সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তখন দর্শকবৃন্দ বাস্তবিকই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকান্না জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদনরোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্য্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া—"যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্" —সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।

"এই নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে

৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণ-দাদাতেও (তাঁর পুত্র ৺গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়েও) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোটকাকামহাশয় (৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়াও অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য শেষে তিনি নিজেই বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোটকাকামহাশয়ই দেশীয় লোকের মধ্যে এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার জন্য সদর রাস্তা ও আমাদের গলিতে একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর

কন্‌সার্টের গৎ তৈরি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কন্‌সার্ট।"

তখনকার কন্‌সার্ট হইতে এখনকার কন্‌সার্ট উন্নত বলিয়া তাঁহার বোধ হয় কি না জিজ্ঞাসা করায়, জ্যোতিবাবু বলিলেন—"তখনকার হইতে কন্‌সার্ট এখন বিশেষ যে কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইহা ত আমার মনে হয় না।"

স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

গৃহ-সংস্কার

হিন্দুমেলা

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই "ভবিষ্যযুক্ত" বৈষ্ণবীটি আসিয়া মেয়েদিগকে বাঙ্গলা পড়াইত। তাহার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান মিশ্‌নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদবধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয়মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।

"বিবাহের পর তিনি "দীপনির্ব্বাণ" নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। "দীপনির্ব্বাণ" প্রকাশিত হইলে, সকল কাগজেই ইহার

বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। Second Yearও প্রায় যায়-যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া, কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া, এই খানে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া, তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য-জরার বজ্রমুষ্টিকে অবহেলা করিয়া, আজিও ফরাসী ভাষা হইতে নিত্য নূতন অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষারম্ভ হইল, এই কাশীপুর উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত "সীজার" (Cæsar) নাটক তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন অহরহ ধ্বনিত হইতেছে :—

"Cæsar tu vas regnier"—সীজার তু ভা রেঙিয়ে ; অর্থাৎ —সীজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

এইখানে অবস্থানকালে, অবকাশ সময়ে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ-বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, বোম্বায়ের প্রতি তিনি ক্রমশঃ

৺জানকীনাথ ঘোষাল

"তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া, পাল্কীশুদ্ধ জলে ডুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জন-সমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া

(১৩০৮ ইং ১৯০১), কৌতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২), কনে-বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা

ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণ-দাদাতেও (তাঁর পুত্র ৺গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়েও) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন।

"ছোটকাকামহাশয় (৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখ-কাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণজালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়াও অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য শেষে তিনি নিজেই বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোটকাকামহাশয়ই দেশীয় লোকের মধ্যে এ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হয়েন।"

এই সময়কার আরও একটি ঘটনা জ্যোতিবাবুর বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্‌ চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার জন্য সদর রাস্তা ও আমাদের গলিতে একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্‌ চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হইয়াছিলেন। আমাদের গৃহচিকিৎসক বেলিসাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। দুয়ারেই দুইজনের চারি চক্ষের শুভমিলন। রাজেন্দ্রবাবুকে যেমন দেখা, বেলিসাহেব একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই, তিনি একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "মার্চ্চেণ্ট আবার ডাক্তার?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্দাদাও একজন সুলেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি "বিক্রমোর্ব্বশী"র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্ম-সঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভালবাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা এখনও থাকিতে পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও* এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ও হয়, সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত।

নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা † লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেন্দ্রবাবু "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়্‌তে হবে" বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী—সম্প্রতি পরলোকগত), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* সতীনাটক হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা এবং "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামক পুস্তকের দোকানের সত্ত্বাধিকারী।

† ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি বহুদিন পরে প্রকাশিত

৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাড়িয়া দিলেন, তখন হার্ম্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তখন ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এখন এত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপযুক্ত নই।"

ব্রাহ্মসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদাই একখানি নোট্‌বুক্ থাকিত; যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্‌বুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্ম্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্নোত্তরের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লইলেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তখনি এক পেয়ালা করিয়া চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে

আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্ম্ম-বীরের একটা স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।”

এই সময়ে কাথ্রাঁ (Cathrin) নামে একজন ফরাসী ৺হেমেন্দ্র-নাথের নিকট চাকরীর জন্য আসিয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে ত্রিশটাকা বেতনে পাচক নিযুক্ত করিলেন। সর্ত্ত হইল, সে পাকও করিবে, ফরাসী ভাষাও পড়াইবে। একবার হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে বোল-পুর গিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

“প্রতিভা (এখন মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) তখন দুই বৎসরের শিশু। কাথ্রাঁকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। হিন্দুমতে আমাদের ব্রাহ্মণ রাঁধিত—কাথ্রাঁও তাহাই খাইত, তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট ছিল না—তবে তাহার ভাতের পরিমাণটা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলিত, ফরাসীতেই গল্প করিত। তাহার কারণ, সে ফরাসী ভিন্ন আর কোনও ভাষাই জানিত না। আমাদের বিলাতী খানা খাইবার ইচ্ছা হইলে, সেই রাঁধিত। সে অল্প খরচে নানাবিধ সুখাদ্য ডিস্ প্রস্তুত করিতে পারিত। সে আবার অবসর মত প্রতিভাকে দোলও দিত। তাহার জন্য গাছে সে একটা দোলনা টাঙ্গাইয়াছিল। দোল দিতে দিতে সে “হাপ্‌লা—হাপ্‌লা—” রবে সোল্লাসে চীৎকার করিত। সে আবার সেজদাদাকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌ও শিখাইত। কাথ্রাঁ বোলপুরে থাকিতে, সেখানকার খোঁয়াড় হইতে কতকগুলি স্ফটিক পাথর জমা করিয়া-ছিল। তাহার পর এক একটা কাঠি বেশ পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া, তাহাতে ঐ সব পাথরগুলি ফলার মত করিয়া বসাইয়া, একদিন সে কি একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। কলিকাতার King Hamil-
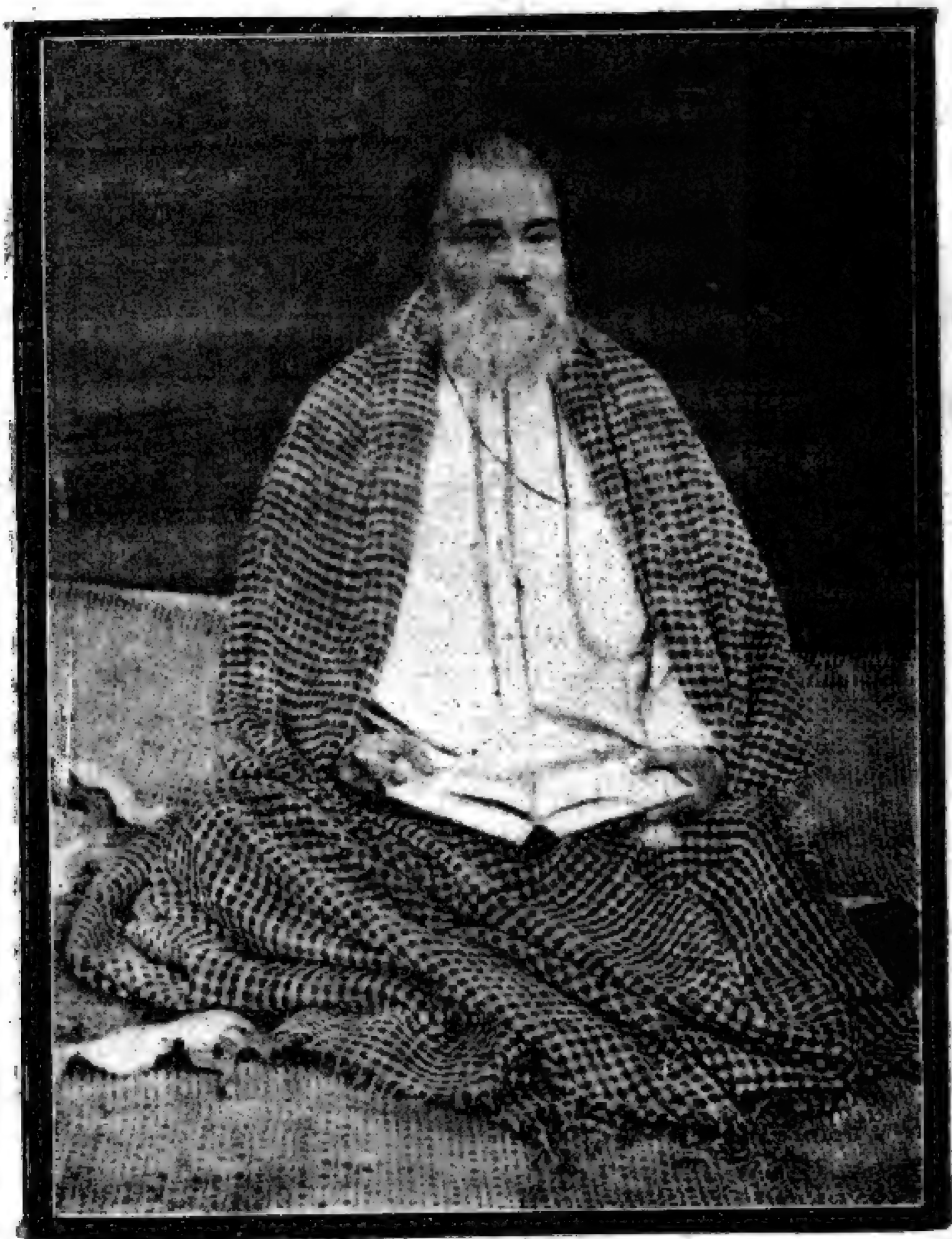
৺শিবনাথ শাস্ত্রী

তাহার নিকট হইতে কিনিয়া লইল। এই সব পাথর আমরা কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদ্বারা যে কোনও প্রকার কায হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের মাথায় কখনও আসে নাই! কিন্তু সে সামান্য একজন অল্পশিক্ষিত ফরাসী,—পাথরগুলিকে কেমন কাযে লাগাইয়া লইল। শুধু কাযে লাগাইল না, তাহার দ্বারা সে গরীব দুপয়সা রোজগারও করিয়া ফেলিল। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এমনই প্রভেদ!

"তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবগণকে ডিনার দেওয়া হইত। কাথ্রাঁই ডিনারের সব প্রস্তুত করিত। একদিনকার ডিনারে, তৎকালীন্ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় আসিয়াছিলেন। আর একবার বঙ্কিমবাবুকেও খাওয়ান হইয়াছিল। বঙ্কিম-বাবুর কথা পরে বলিব।

"কাথ্রাঁ বাস্তবিক রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিল। ফরাসীরা অবশ্য রান্নার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইয়ুরোপের সমস্ত বড় বড় লোকের ঘরে ফরাসী পাচকই থাকে। ফরাসীদের রান্না অনেকটা আমাদেরই মত। ইংরাজদের যেমন এক একটা গোটা জানোয়ার টেবিলে ধরিয়া দেওয়া হয়, ফরাসীদের রীতি কিন্তু সেরূপ নয়। তাহারা মাংস বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, তাহাতে নানাবিধ আনাজ ও মশলা দিয়া, বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করিয়া পাক করে। সে শাক্‌সব্‌জীর নিরামিষ ডিশও অতি সুন্দর রাঁধিতে পারিত। আমাদের যেমন শাকের ঘণ্ট, শুক্তো প্রভৃতি আছে, সেও সস্ (Sauce) ও মশলা দিয়া, এক একদিন সেই ধরণের এক একটা জিনিষ প্রস্তুত করিত। তাহাকে কখনও কি রাঁধিতে হইবে বলা হইত না, কিন্তু সে নিত্য নূতন নূতন রসনা-পরিতোষকারী রন্ধনে যে অদ্ভুত বুদ্ধি ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিত,—তাহাতে আমরা চমৎকৃত না হইয়া পারিতাম না।

"আমাদের সে "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতাসেলাই" পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই করিত—সে হিসাবে তাহার বেতন কিন্তু খুবই অল্প বলিতে হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে আমাদের নিকট ছিল, তারপর একবার ছুটি লইয়া বাড়ী যায়। সেখান হইতে সে নিয়মিত পত্রাদিও লিখিত; কিন্তু ফরাসী-জার্ম্মান্ (Franco-German) যুদ্ধ বাধার পর হইতে, আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বেচারা সেই যুদ্ধেই নিহত হইয়াছে।"

ছেলেখেলা,
নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেযো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র —গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ।

"একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এইবার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তনপান করে, এবং দিন-রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্ছাটিকে লইতে গেলে রূপী একবারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন খায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে তড়িতাহতের ন্যায় উচ্চকিত হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে ফিরিয়াছে। হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

শান্তিধামের দর্শকসংখ্যাও বড় কম নয়! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা ও অপরাহ্ণে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের বিষম ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে

এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল, এবং সভাস্থলে নাটক খানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" বিদেশী আদর্শের একটু গন্ধ যে একেবারে না ছিল তাহাও নহে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তিনি ইংরাজি শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই, খাঁটি বাঙ্গালায় এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

"এখন হইতে "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (Scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় "চিত্ততোষ", আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশ বাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

"পুরু-বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু* প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আমি এক অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরু-বিক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন—সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট্‌ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা জোরাল' সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।

"তারপর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবু-দের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়া ছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্

---

* নাট্যাচার্য্য রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অমৃতবাবু যখন হিন্দুস্কুলে পড়েন, তখন জ্যোতিবাবু প্রেসিডেন্সিকলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। সেটা ইংরাজী ১৮৬৫ সাল। এক একদিন জ্যোতি-বাবুর গাড়ী আসিতে দেরী হইলে, ছুটির পর তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন অমৃতবাবু তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া একদৃষ্টে জ্যোতিবাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন ; তিনি বলেন যে idea of Greek beautyর যেটুকু impression তখন তাঁহার মনে ছিল, সেটুকু যেন তিনি জ্যোতিবাবুর সর্ব্বাবয়বে এবং মুখকান্তিতে প্রস্ফুটিত দেখিতেন। এই সৌন্দর্য্য manly সৌন্দর্য্য, তাহাতে effiminacyর লেশমাত্র ছিল না। তিনি আরও বলিলেন যে, একথা পরে জ্যোতিবাবুকে [illegible]

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

আমাদের সম্মুখেই Dwarkinএর একটি বিশাল piano ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সে বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পিয়ানো, সেতার, তবলা, মন্দিরা, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতির সহযোগে কয়েকটি ঐক্যতান বাদ্য হইল,—এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভদ্রলোক গান করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হইল—আমরাও হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম।

এ আসরে দেখিবার একটি বিশেষ জিনিষ ছিল, সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যবসায় এবং ললিতকলার প্রতি অক্লান্ত অনুরাগ। এক মুহূর্ত্তও না থামিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সমস্ত গানগুলি একে একে গাহিতে তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখা গেল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বেহালা ও পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ক্লান্তি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি প্রকৃতিজয়ী একনিষ্ঠ সাধকের মত একবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য ও ক্লান্তি পরাজিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আপনার মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আসিবার সময় তাঁহার কষ্ট হইল বলিয়া আমরা ক্ষমাভিক্ষা করায় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাদের ত আমোদ হ'ল!"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসিলেন, কিন্তু কথাটা ঠিক। সে হাসিটি শিশুরমত উচ্চ ও সরল।

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

"সরোজিনী" প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়া গেল। পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী দুইখানিই জনসমাজে খুব প্রশংসালাভ করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলাদেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অভূতপূর্ব্ব অমৃতআস্বাদনের তৃপ্তিসুখে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায়, সরোজিনী তখন বাঙ্গলানাটকে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

'কলিকাতা-আর্ট-স্কুলে'র তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চী মহাশয় সরোজিনীর শেষদৃশ্যের একখানি চিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন যাবৎ বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোজিনী-যাত্রা একবার জোড়াসাঁকো বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তখন সভায়, মজলিশে, সর্ব্বত্র গীত হইত।

হাওড়ায় একদিন একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয়, সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমগ্র রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া, দর্শকগণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঘনঘন চিৎকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author."

তখনও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিবাবুরই তখন প্রবল প্রতাপ। জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ দুঃখিত—সে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তবুও চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুব্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত দুইখানি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক যেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কথন'-কথন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তো

"তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া, পাল্কীসুদ্ধ জলে চুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জন-সমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া

(১৩০৮ ইং ১৯০১), কৌতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২), কনে-বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

ফিরিয়া পাইয়া, তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডূয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, তাহাও নয়।

ইহার পর, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন—সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার, জগতে যেন তিনি নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতি-বাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। এই সকল শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী।

হেমেন্দ্রনাথ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও

দুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কখনও দেখি নাই—আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে, বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান-অলঙ্কারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প-স্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাহিতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দি গান ভাঙ্গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ ৮সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের গান লোকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত।”

তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্‌দাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) এই তিনজনে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষি তাঁহাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন।

তখন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে বেশ স্পষ্ট মনে আছে:—“রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত’ ছিলেনই,

"সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। সৌখীন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত। আমার ভগিনীপতি ৺ সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তখন জুয়ালাপ্রসাদ নামক একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেন। তিনি যে সকল গৎ শিখিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ ঢং-এর। ওস্তাদ্‌জী আমার শিক্ষিত গৎগুলি শুনিয়া বলিলেন—এগুলি দিল্লী ঢং-এর। দিল্লী ঢং-এর গৎগুলি একটু বেশী সাদাসিধা। তখন সারদাবাবুর বৈঠকখানাতে প্রায়ই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক প্রভৃতি গুণীগণের মজলিস বসিত। সারদাবাবু একজন সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ধ্রুপদ গাহিতে পারিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুরাণো কোন-রকমে কাযচলা একটা পিয়ানো ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানোটি বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু জ্যোতিবাবু তবুও সেই পিয়ানো বাজাইবার প্রলোভনটি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, এমনই ভাবে একটু একটু করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া, পিয়ানোতেও তাঁহার একটু হাত জমিয়া গেল।

ইহাঁদের বাড়ীতে একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। অবসর মত জ্যোতিবাবু সেটির উপরেও সাক্‌রেদী চালাইতেন। ক্রমে হার্ম্মোনিয়মেও তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা খুব বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়ম আসিল। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একবারেই চলিত হয় নাই। সমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

তিনি আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাঁহার চক্ষুর অসুখ শুনিয়া খুবই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অর্শপীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ইয়ুরোপযাত্রা স্থগিত হইয়া গেল, সে অসুখ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, ডাক্তারেরা এখন তাঁহাকে অন্তত ৩।৪ মাসকাল সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কথা কয়টি বলিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় ভ্রাতৃবাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ বা ৯টা বাজিল। আমরা সেদিনের মত বিদায় ভিক্ষা করায় জ্যোতিবাবু দুঃখ-প্রকাশ করিলেন যে রাত্রি অধিক হওয়ায়, তাঁহার একটি লতামণ্ডপ ও একটি গুহা আছে সে দুইটি আমাদিগকে দেখাইতে পারিলেন না। এই জন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল আসিতে অনুরোধ করিলেন।

আগামী রবিবারে জ্যোতিবাবুকে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সুর শুনাইতে অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন,তিনিও স্বীকৃত হইয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গৃহে সেইদিন একটি মজলিশ হইবে। তিনি আমাদিগকেও তাহাতে হাজির হইবার জন্য সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেদিন যে নিশ্চয়ই আসিব সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে আমাদিগকে ছাড়িলেন।

জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদিগকে নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন। আমরা পথে ভাবিলাম—"আজ সোমবার, রবিবার আসিতে এখনও অনেক দেরী!"

স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়

"কেদার দেদার দুথ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তথনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এথনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে, রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত হাস্যরসিক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্ষয়বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তথন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশটি তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

ইহার কিছু পরে, একদিন তদানীন্তন লাটসাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lansdowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়-দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। রবিবাবু বাল্মীকি, হেমেন্দ্রনাথের বালিকাকন্যা প্রতিভা সরস্বতী, এবং বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্যসত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যথন জলধারা পড়িয়াছিল, তথন অনেকেরই তাহা প্রকৃত

তবু এমনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে,জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও নূতন কিছু দেখিলেই তিনি প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না,এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন, তখনি পকেট হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া রাখিতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন,বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া, নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে দেখা হইলেই, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ-স্থাপনের জন্য কত যে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical Collegeএর Record খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে।"

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, সমাজে বিষ্ণু-বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারেঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগ-রাগিণী ঠিকমত বাজান' যে একরূপ অসম্ভব—ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন।

"মান্নার একটা অদ্ভুত সখ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত গায়ে সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব যেমন তেমন নয়—কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে, সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সর্পাঘাতেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।"

জ্যোতিবাবু আরও বলিলেন—

স্বর্গীয় স্যর. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ ভবনের নাম "শান্তিধাম"। শান্তিধাম বাস্তবিকই শান্তিধাম। এখানে আরও একটি বিশেষ জিনিষ এই যে, ফটকের উপরে ধ্যানীবুদ্ধের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিধামের আর একটি বিষয় বাকী রহিয়া গিয়াছে। প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনা-আপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত-আট জন লোক অনায়াসে সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথরগুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেত্রভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্-বাঁধান'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি একেবারে আচ্ছন্ন।

শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার উদ্যম, "ভারতী" ও "বালক" এবং সারস্বত-সম্মিলনী

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল, "সঞ্জীবনী-সভা"। ছেলেবেলাকার সেই Masonic সভার, ইহা একটি দ্বিতীয় সংস্করণ! ঠন্‌ঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে নাকি একটা স্কুল ছিল, জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক, তাহা তাঁহারা তখন ত জানিতেনই না, আজ পর্য্যন্তও জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আস্‌বাবপত্রের মধ্যে ছিল, ভাঙ্গা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানা-পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও

ছেলেখেলা,
নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেযো' ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা' সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র—গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ।

"একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর

বৈঠকখানায় মহাউৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

"ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!—"

হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হাঃ হাঃ হাঃ" সুরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্য হইত আর ধুপধাপ্ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই শান্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—'এসোনা, আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি।' অমনি গুণদাদার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীরখেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল, [illegible]

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ॥

সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন্ লোকে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নূতন নূতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।”

নূতন লেখকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, “উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে।” গল্পলেখার সম্বন্ধে তিনি বলেন, “গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক, তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই জমে না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে।”

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, “আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, “প্রবাসী,” “ভারতী,” “বঙ্গদর্শনে” একটু একটু লিখিয়া থাকি। লিখিতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না।”

ভাষার আলোচনায় তিনি বলিলেন, “আজ কাল দু’টো নূতন কথা উঠেছে “কী” আর “মতো”। অনর্থক শব্দ বিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে, আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"রাজনারায়ণবাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ, এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত সরলতার একখানি প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের এমন পার্থক্য ও এত প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমান আমি দেখি নাই। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বড় দাদার সঙ্গে যেমন দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ক করিতেন, আমাদের সঙ্গে তেমনি হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতেন। তাঁহার মত এমন অসাধারণ মানুষ, আমি আর দেখি নাই। তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজি ছিল--তিনি ঐরূপ এক একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি কিছুক্ষণ নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, নিজেই উচ্চরবে সকলের আগে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা উচ্চহাসির মধ্যে একটি সুমধুর সরলতা এবং একটা নিরভিমান বিরাট প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত।

"তাঁহার রচিত 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয় সেইখানে, একবার একটি সভা হইয়াছিল। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণবাবু সেই সভায় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালীচরণ তাহার এক তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন

অনেকেই এখন ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, কেবল একমাত্র আমিই এখনও সশরীরে বর্ত্তমান আছি।

"আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগিন্নির ভূমিকায় যখন আর্শির সম্মুখে বসিয়া প্রসাধন করিতেন, ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রূপসীর হাবভাবের অভিনয় করিতেন, তখন সে অভিনয়েও দর্শকেরা খুব আমোদ পাইত। আমাদের আরও দুইজন (tragic actor) করুণ-রসের অভিনেতা ছিলেন। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃত লালের জ্যেষ্ঠ) যখন সুবোধের ভূমিকায়, সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া, নৈশ অন্ধকারে বন-বাদাড় দিয়া চলিয়াছেন, এবং যখন ৺সারদাপ্রসাদ বড়স্ত্রীর ভূমিকায় সপত্নীর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী আক্ষেপোক্তি করিতেন, তখন দর্শকবৃন্দ বাস্তবিকই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না। তারপর গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে, "অমলা" "কমলা" "চন্দ্রকলা" প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়াকান্না জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদনরোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্য্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া—"যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্" —সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।

"এই নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যবয়সে)

...শে প্রচলিত হয় নি। সে চায়ের কি সুগন্ধ! আমাদের ...কক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ লাঠিয়াল্ সর্দ্দার ছিল। সকলের পেয়ালায় যে চা-টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া, চক্ষু খুব আরাম করিয়া সে প্রতিদিনই সেইটুকু খাইত। তখন বাহির ... হিন্দুস্থানী দারোয়ান্ ও অন্দরে বাঙ্গালী সর্দ্দার দিবারাত্র পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে ডাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিত।

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত থাকিতেন—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। গুরুতর রোগ না হইলে সাহেব-ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব-ডাক্তারের উপর তখন সকলেরই অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্পবেতনের হাতুড়ে ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধপত্রাদি দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। ইনি অনেকটা শুশ্রূষাকারিণী নার্সের মত। আমাদের আমলে পীতাম্বর নামে একজন বৃদ্ধ এই শেষোক্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিত। তাঁহার বগলে নিয়তই কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত। তাহার খোপে খোপে নানা রকম রঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোঁড়া পাঁচ্ড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ নানা রঙ-বেরঙের মলম রাখিতেন।"

লেবুর পিরামিড সাজান' থাকিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপ মজুমদার, ভাই মহেন্দ্রনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে"র একজন প্রচারক ও যিনি "Unity and Minister" কাগজের সম্পাদক ছিলেন—সম্প্রতি তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে—ভাই উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ জ্যোতিবাবুর চিত্তফলকে এখনও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানার ঘরে গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে মিলে গাও", "আজ আনন্দের সীমা কি", "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি সকলে মিলিয়া গাহিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "সর্ব্বশেষে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল' প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত, তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের দুর্গাপূজার সেই আনন্দ এবং এ-কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ, এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ! এ এক ছবি, আর সে এক ছবি।"

এই খানে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়ও প্রদত্ত হইল। "উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি ইংরাজী-শিক্ষা একেবারেই পান নাই। সেকেলে রীতি-অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গলা ও একটু ফার্শী জানিতেন মাত্র। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন-স্কুল খোলা হয়, ইনিই সর্ব্বাগ্রে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার দুইটি কন্যাকে বেথুন-স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী। ইঁহার গোঁপ-দাড়ি কামানো, মস্তক মুণ্ডিত এবং মাথায় একটি

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন M. A. B. L.

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভায় সভ্য হইতে পারিবেন।

(৫) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিখিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(৯) সভার অন্যান্য কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায়

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।
আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে, রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত হাস্যরসিক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্ষয়বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তখন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশটি তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

ইহার কিছু পরে, একদিন তদানীন্তন লাটসাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lansdowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়-দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। রবিবাবু বাল্মীকি, হেমেন্দ্রনাথের বালিকাকন্যা প্রতিভা সরস্বতী, এবং বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্যসত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যখন জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র C. I. E.

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে, রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত হাস্যরসিক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্ষয়বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তখন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশটি তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

ইহার কিছু পরে, একদিন তদানীন্তন লাটসাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lansdowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়-দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। রবিবাবু বাল্মীকি, হেমেন্দ্রনাথের বালিকাকন্যা প্রতিভা সরস্বতী, এবং বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয়-পারিপাট্যে ও গানে সকলেই খুব প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্যসত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যখন জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত

জ্যোতিবাবু কাছারী-বাড়ীর হাতায় পৌছিয়া আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। তাঁহার লোকেরা বন হইতে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মাথায় লাঠি মারায় মাথাটা একবারে থেঁৎলিয়া গিয়াছিল। সে একটা গোটা শেয়াল গিলিয়াছিল। লাঠির আঘাতে অজগর সেই শেয়ালটা উগ্‌রাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অর্দ্ধপচিত শেয়ালের দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠানো ভার। জ্যোতিবাবু কলিকাতায় ফিরিবার সময় সেই চিতাবাঘের স-মুণ্ড চর্ম্ম ও পিঞ্জরাবদ্ধ সেই জীবন্ত অজগর—এই দুই ভীষণ হিংস্র জীবের হত্যাবশেষ ও জীবন্ত নমুনা—শিকারের বিজয়নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো বাটীতে কিছুদিন রাখিয়া, অজগরকে কলিকাতার পশুশালায় উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরাকার লৌহ-তারের পিঞ্জরে এই অজগরটিকে সযত্নে রাখিয়া সেই মন্দিরের গায়ে উপহার-দাতার নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্পটি এ উদ্যানে অনেকদিন যাবৎ ছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবু তাঁহার অজগরকে দেখিতে যাইতেন। তাহার পর, একবার গিয়া দেখেন সে পিঞ্জরও নাই—সে অজগরও নাই। শুনিলেন, সেটি মরিয়া গিয়াছে।

আর একবার জ্যোতিবাবু হাতীর উপর চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই তাঁহার প্রথম হাতীর উপরে চড়িয়া বাঘ-শিকারে যাওয়া। একটা ঘন-নিবিষ্ট দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের ভিতর বাঘটা আছে, শুনিলেন। হাতী বড় বড় বাঁশঝাড় মড়্‌মড়্ শব্দে পদদলিত করিয়া সেই দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ হাতীটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু

অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। জ্যোতিবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটা ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর হাতীটি শিকারী ছিল না। হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে হইলে, অন্য জমিদারের নিকট হইতে শিকারী হাতী ধার করিতে হইত। তিনি তাহাদের হাতীটিকে শিক্ষা দিয়া শিকারী করিয়া তুলিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, তাহাকে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া, তিনি একদিন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। হস্তিবরের শিকারশিক্ষার এই প্রথম পাঠ। কিন্তু হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না—শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না—সে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমন গা-দোলা দিতে লাগিল যে, জ্যোতিবাবুর সমুদ্রপীড়ার মত পীড়া উপস্থিত হইল। তাহা ছাড়া লম্প ঝম্প দৌড় ছুট প্রভৃতি ব্যায়ামসাধ্য কার্য্যে অনন্যমনা হইয়া এমনি মনোনিবেশ করিল যে, তাহার তাদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে শুভানুধ্যায়ীর প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিল। কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। জ্যোতিবাবু বলিলেনঃ—

"মাহুৎ অঙ্কুশ প্রহার করিয়া "বয়েঠ" "বয়েঠ" করিয়া বসাইবার কত চেষ্টা করিল, কিন্তু হাতী কিছুতেই সে আদেশ পালন করিল না। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—অপরাহ্ণ হইল—তবু মাহুৎ হাতীকে বসাইতে পারে না। আমি ত হাতীর উপর আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেছি না;—ভয়ে এবং ক্ষুৎপিপাসায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য। কি করি, শেষে যাহা থাকে কপালে, নিশ্চেষ্ট হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে মরার অপেক্ষা শ্যামল ধরণীতে এমন কি

বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। Second Yearও প্রায় যায়-যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তিনি খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া, কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া, এই খানে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া, তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য-জরার বজ্রমুষ্টিকে অবহেলা করিয়া, আজিও ফরাসী ভাষা হইতে নিত্য নূতন অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষারম্ভ হইল, এই কাশীপুর উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত "সীজার" (Cæsar) নাটক তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার প্রথম চরণের একটু অংশ এখনও তাঁহার কর্ণে যেন অহরহ ধ্বনিত হইতেছে :—

"Cæsar tu vas regnier"—সীজার তু ভা রেঙিয়ে ; অর্থাৎ —সীজার তুমি রাজত্ব করিতে যাইতেছ—ইত্যাদি।

এইখানে অবস্থানকালে, অবকাশ সময়ে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ-বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বায়ের অনেক গল্প শুনিতেন। বোম্বায়ের গল্প সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে, বোম্বায়ের প্রতি তিনি ক্রমশঃ

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার B. L.

[১০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভায় সভ্য হইতে পারিবেন।

(৫) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষসংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ, অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৭) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে—তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনা-লিখিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজ মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(৯) সভার অন্যান্য কার্য্যবিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায়

এই হইল যে, বাঙ্গলায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক আমিই সর্ব্বপ্রথম "জাহাজ-চালান" প্রবর্ত্তন করিব, এই গর্ব্ব। দ্বিতীয়তঃ, সকলেই যখন এ খোলটি কিনিতে উদ্‌গ্রীব তখন নিশ্চয়ই এটি সস্তা হইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ের দিক দিয়া এ কথাটিও তখন খতাইয়া দেখিলাম। অতএব পুনর্বিক্রয়ে ক্ষতি। কথাটা ঠিক! তখন লোকে যদি বলিত "না এটা ঠকা' হয়েছে" তাহা হইলে আমি যে কি করিতাম, তাহা এখন বলা কঠিন। সকলের লুব্ধ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরে আমি যে জাহাজের খোল কিনিলাম, ইহাতে আর কোনও লাভ হউক বা না হউক— এই কেনার উত্তেজনাই, সে মুহূর্ত্তে একটা মহৎ গর্ব্ব! যাহাই হউক, জাহাজের খোল কিনিয়া সগর্ব্বে বাটী ফিরিলাম, যেন কি একটা রাজ্যই জয় করিয়া আনিলাম!

"বুশ্‌বী (Bushby) গবর্ণমেন্টের জাহাজসমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে ষোলটাকা ফী দিয়া এই খোলটি দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a splendid Steamer" (ইহাতে অতি সুন্দর একখানি ষ্টীমার তৈরি হইবে)। আর কি! আমি অমনি হাওড়ায় বড় বড় সব জাহাজের কারখানায় ঘুরিতে লাগিলাম, কে আমার এই জাহাজখানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কায ছিল যে, বড় বড় কোম্পানির মধ্যে কেহই এ কায লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart কোম্পানি এই জাহাজনির্ম্মাণের ভার লইল।—সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম রাখিলাম "সরোজিনী"। জাহাজখানি খুব শীঘ্রই দিবার কথা ছিল, কিন্তু Kelso কোম্পানি তাহা পারিল না। তদ্ব্যতীত জাহাজ বড় হইল বটে, কিন্তু তেমন মজবুত হইল না। সে যেন এক

খারাপ, পরশ্ব বয়্‌লার খারাপ, এই রকম প্রত্যহই একটা-না-একটা গোলমাল ঘটিতেই লাগিল। আর সেই সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থব্যয় হয়, কাযও বন্ধ রহিয়া যায়। দেশীয় চালক যাহারা ছিল, তাহারা কল-কব্‌জার বিষয় ভাল বুঝিত না। সামান্য একটু কিছু হইলেই জাহাজ অমনি বন্ধ। আমি বিব্রত হইয়া একজন উপযুক্ত লোক খোঁজ করিতে লাগিলাম। জাহাজের কলকব্জা বিষয়ে অভিজ্ঞ সুদক্ষ মনের-মত একজন ফরাসীকে পাওয়াও গেল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলাম। সে-ই জাহাজের Commander হইল। তাহার উপরেই জাহাজের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলাম। কল খারাপ হইলেই সে অমনি আস্তিন্‌ গুটাইয়া যেরূপ অক্লান্তভাবে কায করিত, সেরূপ কায দশ জন খালাসীতেও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার একটি মস্ত দোষ ছিল। মাসের মধ্যে একবার করিয়া সে মাতাল হইত। তখন সে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া খালাসীদিগকে বক্‌সিশ দিত, খয়রাৎ করিত, জাহাজের সাবানাদি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অনেক অপচয় করিত। কিন্তু দুই একদিন পরে, নেশা কাটিয়া গেলেই আবার সে যে-ভাল-মানুষ সেই ভালমানুষ—যারপরনাই বাধ্য। যাহাই হউক, এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া আমার যেমন অনেক খরচ বাঁচিয়া গেল, তেমনি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কাযকর্ম্মও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

"আমি এ লাইনে কায আরম্ভ করিবার খুব অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতই হইতে Flotilla Company নামে এক কোম্পানি আসিয়া কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছিল। আমি যখন সর্ব্বপ্রথম কার্য্য আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছিলাম, তখন যদি পারিতাম তাহা হইলে আমার অনেক সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম জাহাজ "সরোজিনী" তৈরি

ছবি হারানোতে তিনি এখনও বিশেষ দুঃখিত—সে ছবিটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের। তবুও চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও ক্ষুব্ধ।

যাহাই হউক,—পূর্ব্বকথিত জয়গোপাল শেঠ নামে তাঁহাদের যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষক মহাশয় যেমন পাত্‌লা, তেমনি অসাধারণ রকমের লম্বাও ছিলেন। গরুড় পক্ষীর প্রসিদ্ধ নাসিকাটির মত তাঁহার কণ্ঠনালীটি সম্মুখ দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; হাত দুইখানি দুই পাশে প্রসারিত করিয়া, আঙ্গুলগুলি মেলিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, চলিতেন ঠিক যেন হাড়গিলাটির মত; কণ্ঠস্বর একটু অনুনাসিক; হাসিলে তাঁহার মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁতগুলি বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করিত; তাঁহার দেহবর্ণ তবু একটু ফর্সা ছিল। মাষ্টার মহাশয়ের পরিচ্ছদও ছিল এক অদ্ভুত রকমের। পরিধানে ধুতি, অঙ্গে একটা সাদা লংক্লথের চাপ্‌কান, বুকে ভাঁজ করা একখানা চাদর, পায়ে ফুল্ মোজা এবং মাথায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাঁজকরা একটা সাদা পাগড়ী;—এমনি পাগ্‌ড়ীই নাকি তখন সব আফিসের কর্ম্মচারীরা ব্যবহার করিতেন। তাম্বুলরাগ অধরওষ্ঠের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চিবুক এবং বক্ষস্থ উত্তরীয় পর্য্যন্ত কথন'-কথন' সবেগে ধাবমান হইত।

একদিন ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র পরামর্শ করিয়া, এই শিক্ষক মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চেয়ারের আসনটিকে বেশ করিয়া মসীরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তত লক্ষ্য করেন নাই, যেমন বসিয়াছেন অমনি কালির ছাপে তাঁহার চাপ্‌কানটি তাঁহার পশ্চাতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া গেল। এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তো

বলা বাহুল্য, এগুলি সবই জ্যোতিবাবুরই হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্রসম্পদের অভাব কিন্তু কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহারও একটু পরিচয় দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সেই 'দেশ দেশ' গানটা গাও ত ?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই-বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই, আমাদের দেশ ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পূবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই, পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি, ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই, আমাদের দেশ ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই, যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ—
—ভাই, আমাদের দেশ ॥

এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইঁহারা ফিরিতেছেন, কেশববাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক একদিন Eden's Park-এ যখন পৌঁছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার হাঁক দিয়া (challenge করিয়া), বলিত—"হুকুম্—সদর" (who comes there?)।

জ্যোতিবাবু বলিলেন—"ধনী ও গরীব লোকেদের মধ্যে গরম কাপড়ের তখন তেমন বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প পয়সার লোকেরা শীতকালে দোলাই ব্যবহার করিত। এখন যেমন সস্তা বিলাতী শাল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন তাহা ছিল না। ধনীরা শীতকালে শাল দোশালা জামিয়ার রেজাই প্রভৃতি ব্যবহার করিত। এখন যেমন রেশ্মী চাদরের ফ্যাসান হইয়াছে (বোধ হয় সস্তা বলিয়া) তখন তাহা ছিল না।"

পথে বাহির হইয়া কে কি করিতেন,—তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে আমরা নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তাহাতে পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই এক খেলা হইল—যে, কে আগে কয়টা গ্যাস-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব দ্রুত চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা" অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, সেদিন তাহারই জিত হইত!

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

[৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ।

জমীদার, দোকান্দার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে-ছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তাও ছিলেন। সেদিন ছাত্রদের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়া ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখ্‌লে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

"সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল-কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান কর্‌তে কর্‌তে সংকীর্ত্তনের দল"—"বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্‌ —যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগল—তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্পকথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

"নগর-সংকীর্ত্তনে যে কি মাতান' ভাব, আমি সেদিন বেশ বুঝতে পার্‌লেম্‌। এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়, তা হলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব-প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিয়ে লিখে দিলাম। এই গানটায় লোকেরা যে কি-রকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুনলে শুধু কথায় তা বোঝা যাবে

কে কোথায় আছিস্ ভাই আয়রে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে শত কণ্ঠে এক তানে
সবে মিলে গাই গীত মৃত-সঞ্জীবন॥

(একতালা)

(ও ভাই) দেখ, সব ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে
দেশের দশা একবার করে না স্মরণ।
(একবার চায় না রে কেউ নয়ন মিলে)
(একি রে কাল-নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব
নিদ্রাগত প্রাণে আনিব চেতন।
(এ ঘোর দুঃখনিশি অবসানে)
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি,
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন,
(মিলে প্রেমসূত্রে প্রাণে প্রাণে)
দেখবে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,
কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।
(ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা !

(রূপক)

আহা, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

স্বর্গীয় মনোমোহন বসু

[১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত]
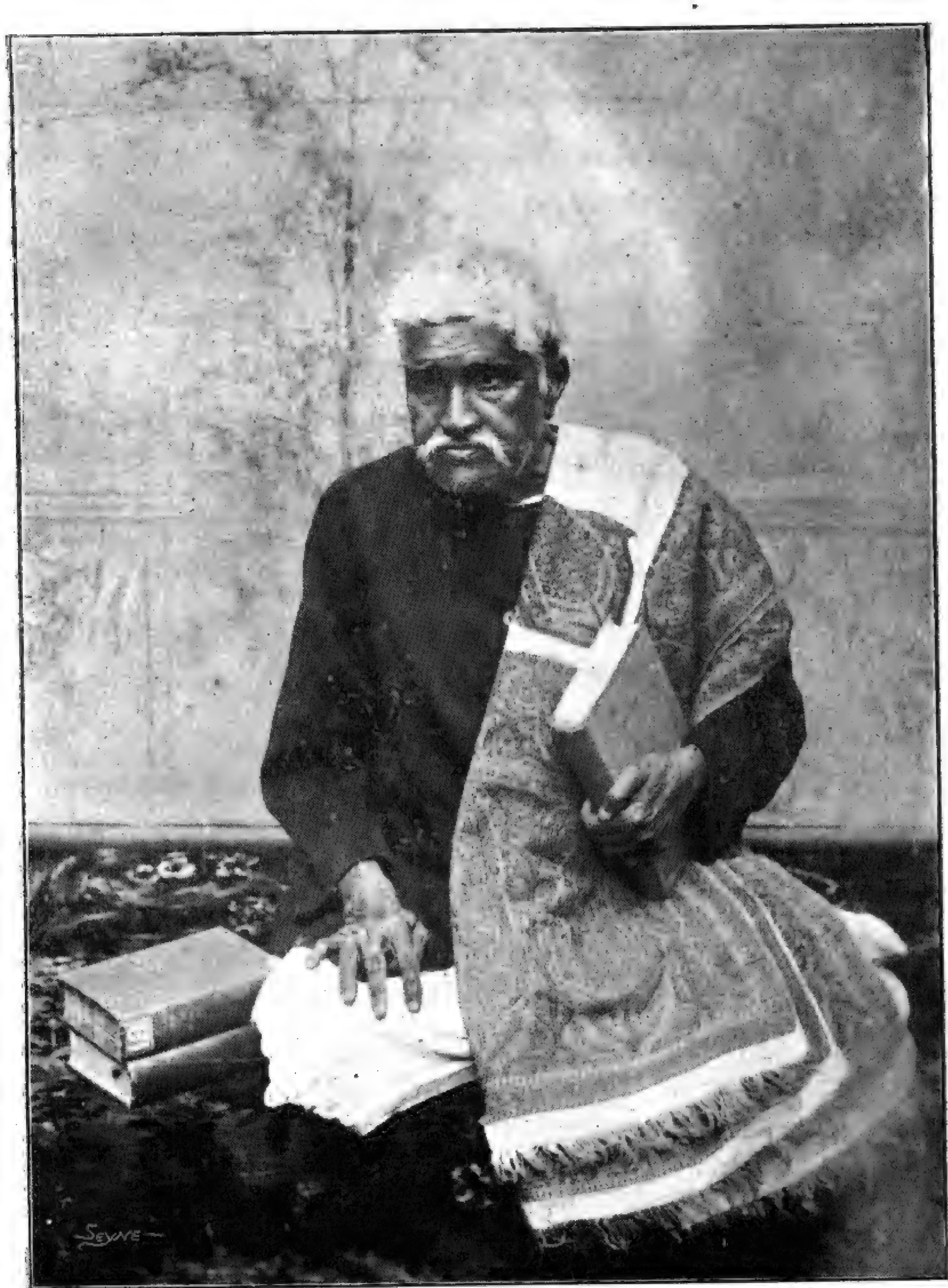
(মনোহর সই—একতালা)

শত্রু মিত্র মিলে ঘরের বিবাদ ভুলে
গলাগলি হ'য়ে গাই রে
(আজি) দেশের কাযে মোরা হয়ে মাতোয়ারা
স্বার্থের কথা ভুলে যাই রে
(দেশের প্রেমে মত্ত হ'য়ে)
(মায়ের চরণ সেবায়)
(করি) হয়ে একমন মায়েরই কীর্ত্তন
(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাই রে।
বিংশতি জাতিতে বিংশতি ভাষাতে
মেদিনী কাঁপায়ে গাই রে।
(জয় ভারতজননী বলে')
(সমস্বরে সবে)

(রূপক)

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার জগত-ভূষণ।

(ঝুলন)

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে, তোরাই রলি'
—শুধু তোরাই ঘুমে রলি' শুধু তোরাই ঘুমে রলি'।
নবীন আলোয় ভাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি।
(চেয়ে দেখ্‌ দেখ্‌রে ও ভাই)

তবু এমনি তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা যে,জ্বরে কাতরাইতে কাতরাইতেও নূতন কিছু দেখিলেই তিনি প্রশ্ন করিতে ছাড়িতেন না,এবং যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতেন, তখনি পকেট হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া রাখিতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন,বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া, নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিতেন। আমার সঙ্গে দেখা হইলেই, তিনি আমাকে বলিতেন,—"তোমার ঠাকুরদাদা ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুর মেডিকাল কলেজ-স্থাপনের জন্য কত যে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা Medical Collegeএর Record খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে।"

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, সমাজে বিষ্ণু-বাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানী সারেঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হার্ম্মোনিয়ম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগ-রাগিণী ঠিকমত বাজান' যে একরূপ অসম্ভব—ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন।

"মান্নার একটা অদ্ভুত সখ ছিল। বাড়ীতে সে সদা সর্ব্বদা মহাদেবের মত গায়ে সাপ জড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সাপও সব যেমন তেমন নয়—কেউটে গোক্ষুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। সাপগুলিকে গায়ে জড়াইবার আগে, সে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিলেও নাকি আবার গজায়, তাই সর্পাঘাতেই অবশেষে তাহার মৃত্যু হয়।"

জ্যোতিবাবু আরও বলিলেন—

ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও* এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ও হয়, সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত।

নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা † লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেন্দ্রবাবু "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়্‌তে হবে" বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী—সম্প্রতি পরলোকগত), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিনজনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* সতীনাটক হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা এবং "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামক পুস্তকের দোকানের সত্ত্বাধিকারী।

† ১৩১৩ সালের পৌষ সংখ্যা "ভারতী"তে কবিতাটি বহুদিন পরে প্রকাশিত

মুখোপাধ্যায় (তখনও রাজা হয় নাই) আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন 'উভয়পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি ? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্লোটিলা-কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।' আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহাসুযোগ উপস্থিত—এ সুযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। তখন যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন দিন আপনাআপনিই কায গুটাইতে হইত, সে ক্ষেত্রে তাহা হইলে ত কিছুই পাওয়া যাইত না। অতএব এখন বেশ মানে-মানে—উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হউক, যা-হয় কিছু পাওয়াও যাউক। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্লোটিলাকোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম।

"ফ্লোটিলাকোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ন্যায্য তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ঋণপরিশোধ করিতে পারিলাম না! খুব বিপন্ন হইয়া পড়িলাম ; শেষে পালিত মহাশয় (স্যর টি পালিত) সমস্ত পাওনাদারদের ডাকাইয়া তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার ঋণের বোঝা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে, তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আমি একেবারেই ঋণমুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি এখন দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত, তাঁহার পরিচয় কে না জানে ? কিন্তু তিনি যে আবার কেমন বন্ধুবৎসল, তাহা তাঁহার এই কাযেই লোক পরিচয় পাইবে। শুধু আমাকে নয়, এমনি কত লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যে তিনি তাঁহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার আর গণনা হয় না।

স্বর্গীয় স্তর তারকনাথ পালিত

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"রাজনারায়ণবাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ, এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত সরলতার একখানি প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের এমন পার্থক্য ও এত প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনও বিন্দুমাত্র অভিমান আমি দেখি নাই। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বড় দাদার সঙ্গে যেমন দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ক করিতেন, আমাদের সঙ্গে তেমনি হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতেন। তাঁহার মত এমন অসাধারণ মানুষ, আমি আর দেখি নাই। তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজি ছিল--তিনি ঐরূপ এক একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি কিছুক্ষণ নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, নিজেই উচ্চরবে সকলের আগে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা উচ্চহাসির মধ্যে একটি সুমধুর সরলতা এবং একটা নিরভিমান বিরাট প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইত।

"তাঁহার রচিত 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয় সেইখানে, একবার একটি সভা হইয়াছিল। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণবাবু সেই সভায় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালীচরণ তাহার এক তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন

ভারত সঙ্গীত-সমাজ-প্রতিষ্ঠা

ও

সংস্কৃত নাটক অনুবাদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্যোতিবাবু এককালে শির-সামুদ্রিক (Phrenology) বিদ্যার খুবই চর্চ্চা করিতেন। এই সময় "সাধনা"য় একবার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে—যে-কোন ব্যক্তি জোড়াসাঁকো বাটীতে আসিয়া জ্যোতিবাবুর নিকট, ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে মাথা-পরীক্ষা করাইতে পারিবেন। লোকে হুজুগ্ চায়। দুইটি চারিটি দশটি করিয়া ক্রমশঃ লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে, বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত অনবরত পরীক্ষা করিয়াও তিনি শেষ করিতে পারিতেন না।

অনেক দিন হইতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ছবি আঁকেন ও তাঁহার মস্তক-পরীক্ষা করেন, কিন্তু এ সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। "বালকে" বিদ্যাসাগরমহাশয়ের যে ছবি ও মস্তক-পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেটা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রচলিত বাজারে বিক্রীত ছবি দেখিয়া আঁকা। একদিন কোনও একটি বিবাহ-সভায় জ্যোতিবাবুর সহিত বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিবাবু তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি একদিন জ্যোতিবাবুকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গপ্রয়াণ করেন। জ্যোতিবাবুর এ সাধ আর পূর্ণ হইল না, এজন্য তিনি এখনও
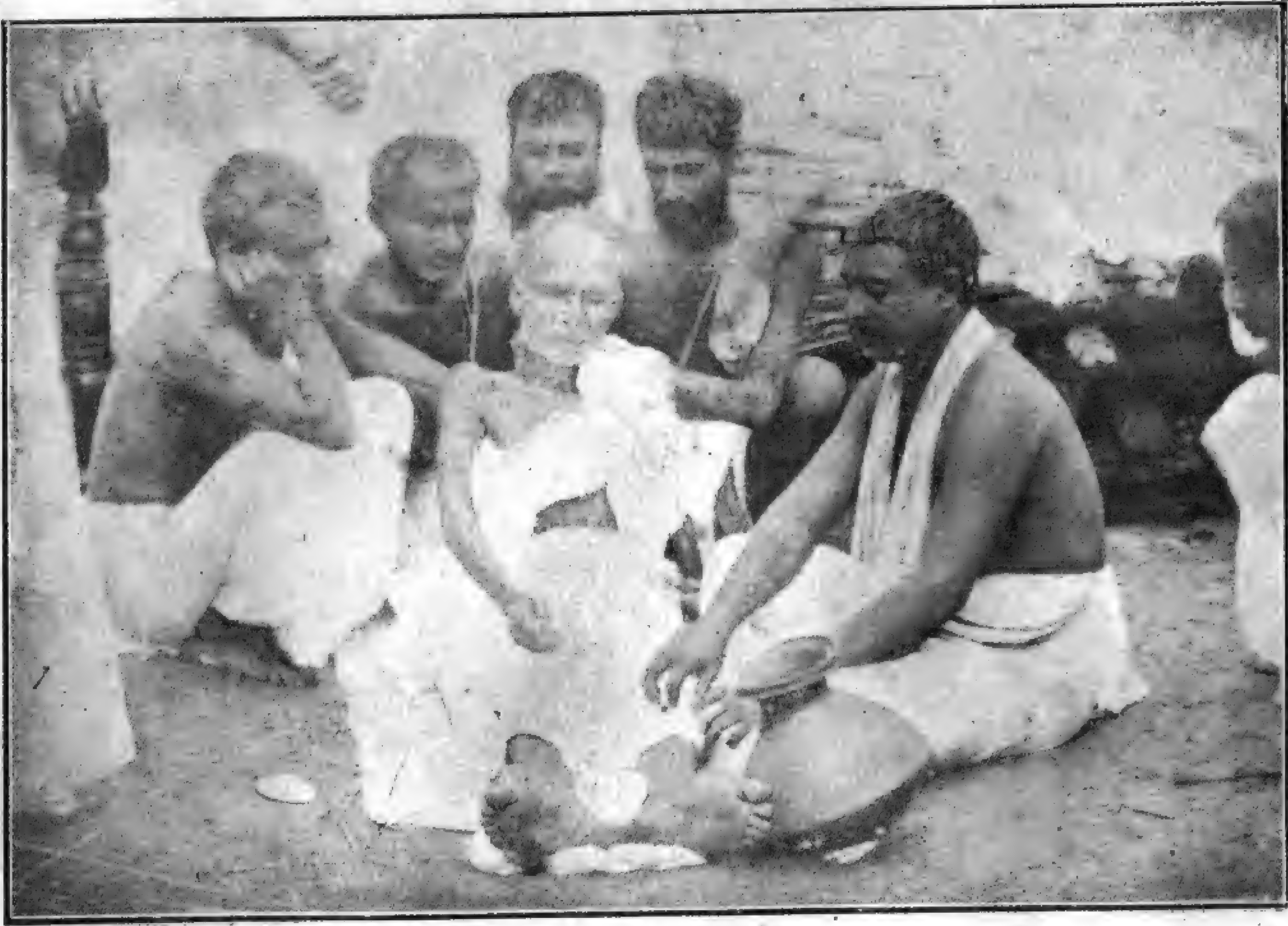
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ-শয্যা

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও চিত্রাঙ্কন-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কবিতাটি অপ্রকাশিত):—

"বেয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুন্‌গুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
ল'ন্ যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আন্না,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না!"

জ্যোতিবাবু বলেন, অতিলৌকিক রহস্য-ব্যাপার জানিবার জন্য তাঁহার একবার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্‌বক্তা বা ঐ জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধুবান্ধবসহ সেইখানে গিয়া হাজির হইতেন। কিন্তু পনের-আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু ফাঁকি দেখিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সে সখ মিটিয়া গিয়াছিল। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।'

"প্ল্যাঞ্চেটে"র কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনকখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "একবার আমার গুণুদাদা এবং ভগিনীপতি যদুনাথ ক[illegible]ট-কাষ্ঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মা

কর্ম্মচারী। লোকটি খুবই মজলিসি ও সুরসিক ছিল। তাহার প্রেতাত্মাকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, বলিল :—"আমি কত কষ্ট করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তাহা জানিতে চাহেন কোন সাহসে? আপনারা ত বড় মজার লোক দেখি?" তাহার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিতেছি :—

"আপনারা যাহাকে "ইস্ফীয়ার" (sphere) বলেন, মৃতেরা মৃত্যুর পর সেইরূপ এক-এক ইস্ফীয়ারে গমন করে।"

"সকলেরই যাত্রা-পথ এক।"

"প্রথমে কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকে।"

"এখানে, মশায়, আর যাই থাক্, পেটের জ্বালা নাই।"

"যে ঘরে এই সব কাণ্ড হইতেছিল, সেই ঘরে কয়দিন হইতে জমিদারীসংক্রান্ত দরকারী একটা কাগজ খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। প্রেতাত্মাকে আমরা সেই কাগজখানির সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর পাইলাম—জলের পাইপ্‌ওয়ালা অমুক ব্যক্তির নিকট খোঁজ করুন, পাবেন। আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। পরে দেখা গেল যে—সেই পাইপ্‌ওয়ালার বিল্ প্রভৃতি কতকগুলি কাগজের সঙ্গে উক্ত কাগজখানিও ভুলক্রমে চলিয়া গিয়াছিল।"

এবম্প্রকার সখ যখন মিটিল, তখন জ্যোতিবাবু আবার সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে, এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইল। এইজন্য প্রথম প্রথম "ভারতী"তে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা [illegible] সরল এবং শিক্ষার্থীরও বোধগম্য [illegible] স্বরলিপি

"তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া, পাল্কীসুদ্ধ জলে ডুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জন-সমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া

(১৩০৮ ইং ১৯০১), কৌতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২), কনে-বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা

বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।

তদনুসারে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদ-পত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এইরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও তন্নিবারণের আবশ্যকতাও বুঝিলেন। সভাস্থাপন-কল্পে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহ বা দুইশত রজতমুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ নিজ পরিবার হইতেই দ্বিসহস্রেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বেশ কাযꣳ চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলি-কাতায় আসিলেই, এই সমাজে তাঁহার গানবাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলামেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্য্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

এবারকার দলাদলিতে বেশ গাঢ় রকমের একটু ঢলাঢলিও হইল। একদল অন্যদলকে "সঙ্গীতসমাজ" হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চায়,

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর I. C. S.

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো, যে রেখা-চিত্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (অধুনা লর্ড সিংহ) মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র —তখন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাহার উপর, তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন। সে সকল চিত্র চোত্মা কাগজেই অঙ্কিত হইত, সেগুলিকে রক্ষা করার কথা তখন কাহারও মনে

(মহর্ষির) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজের কাযকর্ম্ম বেশ সুচারুরূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।"

বেদব্যাসের বিশ্রাম

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ক্রমে ক্রমে আমার বাল্যসহচর বন্ধুবান্ধব, একে একে সকলেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণবিহারীও চলিয়া গেলেন। মধ্যে, কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হইত না ; কিন্তু ইদানীং তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী আসিতেন। আমরা ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিয়া মন খুলিয়া খুব গল্প করিতাম। একদিকে তাঁহার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁহার হৃদয়ও স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল। যখন তাঁহার সায়েটিকা রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিত, তখন তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র জন্য ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়া, সেই যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস ছিল না—কিন্তু পরে, সাধনার বলে, বাঙ্গলা লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলাভাষায় "অশোকচরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ কৃষ্ণবিহারীরই রচনা।"

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার রাঁচী আসিয়াছিলেন। বারকয়েক রাঁচী আসা-যাওয়াতে, রাঁচী তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহার ফলেই তিনি এখানে এখন "শান্তিধাম" নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

জীবন কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "যতদূর মনে পড়িল, তাহা ত' বলিলাম। এখন এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম! তোমার পাঠকেরাও হয়ত হাঁপ ছাড়িয়া বলিবেন—'রাম বল, বাঁচ্‌লাম'।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)
৺গিরীন্দ্রনাথ
৺নগেন্দ্রনাথ
দ্বিজেন্দ্র
সত্যেন্দ্র
৺হেমেন্দ্র
৺বীরেন্দ্র
সৌদামিনী
জ্যোতিরিন্দ্র
শরৎকুমারী
সোমেন্দ্র
রবীন্দ্র
৺গণেন্দ্র
৺গুণেন্দ্র
৺বলেন্দ্র
দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, ৺নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র, কৃতীন্দ্র
সুরেন্দ্র
৺হিতেন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
ঋতেন্দ্র
স্বর্ণকুমারী
বর্ণকুমারী
রথীন্দ্র
দীনেন্দ্র
অজীন্দ্র
সৌম্যেন্দ্র
স্বরীন্দ্র
সুবীরেন্দ্র
হৃদিন্দ্র
ক্ষেমেন্দ্র
ঋদ্ধীন্দ্র
সুভোগেন্দ্র
গগনেন্দ্র
সমরেন্দ্র
অবনীন্দ্র
৺সমীরেন্দ্র
সুবীন্দ্র
অলকেন্দ্র
৺গেহেন্দ্র
কনকেন্দ্র
নবেন্দ্র
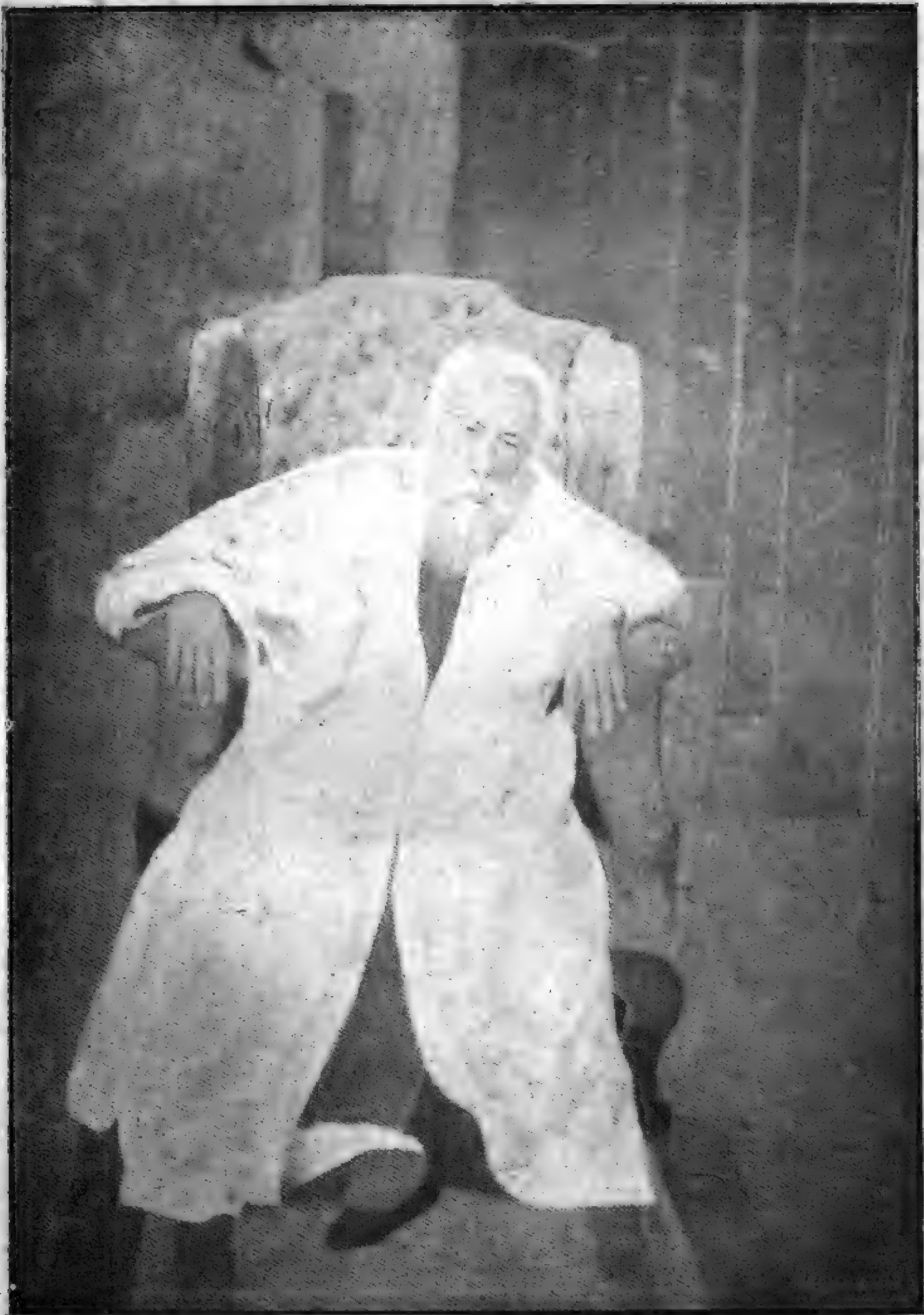
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৮৭ বৎসর বয়সে)

ছেলেখেলা,
নাটক-রচনা ও অভিনয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী আর একজন ছিলেন, তিনি ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুণেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিলেন যে—“গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় লোক ছিলেন। আমরা দুইজনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। “এ-বাড়ী” আর “ও-বাড়ী”। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাযে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেযো’ ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা’ সে ছেলেমানুষীই হউক্ আর যাই হউক। গুণুদাদার তিন পুত্র—গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ।

“একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন “সংবাদ-প্রভাকর” হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা “অদ্ভুতনাট্য” খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর

and India's missions (ভারত ও ভারতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল) প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্‌সাহেব কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কর্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌তেন, আর না ছিল এমন কোন বন্ধুবান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ কর্‌তে পার্‌তেন। ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃঃ) তত্ত্ববোধিনী সভা সবে-মাত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং সেই সঙ্গে অন্তত ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব কর্‌তে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম হোল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।

নামে অবশ্য ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র এবং সেই সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল—তিনিই ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন কর্‌তেন। এই পত্রিকাপ্রকাশ করায়, দেবেন্দ্রনাথের অল্প সাহস ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি। সে সময়ে বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গসাহিত্যপ্রিয় পাঠকেরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এটা বেশ জানা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যও যেমন গ'ড়ে তুলতে হবে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের পাঠকেরও সৃষ্টি কর্‌তে হবে। বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা বল্‌তে গেলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা

সাহিত্য এখন অনেক উন্নত। এখন্ লোকে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত। এ বড়ই শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন লেখকেরা নূতন নূতন স্থানের বিবরণ দিয়া নানা স্থানের কাহিনী, উপকথা, আচারব্যবহারের ইতিহাস দিয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিন দিন সমৃদ্ধ করিতেছেন।"

নূতন লেখকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন প্রতিভাবান কবি। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতাও আমার ভাল লাগে। গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে।" গল্পলেখার সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গল্পলেখা অবজ্ঞার জিনিস নহে—এতেও খুব গুণপনা আবশ্যক। গল্পের Plot রচনা করিতে ও চরিত্রাদি বর্ণনা করিতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক, তারপর মানবচরিত্রে অধিকার না থাকিলে গল্প মোটেই জমে না; এ হিসাবে গল্প ও উপন্যাসের মূল্য অল্প নহে।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই, এখন কোনও রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা—এ একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, "প্রবাসী," "ভারতী," "বঙ্গদর্শনে" একটু একটু লিখিয়া থাকি। লিখিতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না।"

ভাষার আলোচনায় তিনি বলিলেন, "আজ কাল দু'টো নূতন কথা উঠেছে "কী" আর "মতো"। অনর্থক শব্দ বিকৃতিতে লাভ কি? অধিকাংশ স্থলেই অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়—দুই এক স্থলে অর্থের অস্পষ্টতা হতে পারে, আমি স্বীকার করি। যেখানে অস্পষ্টতার সম্ভাবনা আছে

"এই সময়ে সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ) একবার খুব পীড়িত হইয়াছিলেন। আমাদের গৃহচিকিৎসক বেলিসাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। আবার তলে তলে রাজেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথিও চলিতেছিল। একদিন রাজেন্দ্রবাবু রোগীর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় বেলিসাহেব রোগীকে দেখিতে আসেন। দুয়ারেই দুইজনের চারি চক্ষের শুভমিলন। রাজেন্দ্রবাবুকে যেমন দেখা, বেলিসাহেব একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে টুপি ফেলিয়াই, তিনি একছুটে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "মার্চ্চেণ্ট আবার ডাক্তার?" এই বিপদে গণেন্ দাদা সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন।

"গণেন্‌দাদাও একজন সুলেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি "বিক্রমোর্ব্বশী"র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্ম-সঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভালবাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা এখনও থাকিতে পারে। তিনি খুব অল্প বয়সেই মারা যান।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর

"তাহার পর ক্রমশ, তাঁহার উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল—আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত।

"আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ২।১ জন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া, পাল্কীশুদ্ধ জলে চুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু এই অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম মেজদাদা অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আর কেহই হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয় না। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তৎকালীন জনসমাজে অনেক অপ্রিয় মন্তব্যও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল, তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া

(১৩০৮ ইং ১৯০১), কৌতুকনাট্য (১৩০৮ ইং ১৯০১), দেবকৌতুক (১৩১২), কনে-বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০)। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকুমারীর রচিত কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকও আছে; যথা—গল্পস্বল্প, সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এবং কীর্ত্তিকলাপ।

লেখিকা মহাশয়ার ভ্রমণ এবং নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ যাহা

ছাড়িয়া দিলেন, তখন হার্ম্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তখন ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এখন এত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপযুক্ত নই।"

ব্রাহ্মসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদাই একখানি নোট্‌বুক্ থাকিত; যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্‌বুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্ম্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্নোত্তরের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লইলেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তখনি এক পেয়ালা করিয়া চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে

বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সীঁথি। চোখ দু'টী বড় বড়, লোচন প্রতিভা-দীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা'-ভাঙা'। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা-গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবি—" ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতিশয় সহৃদয়, আমুদে, এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে কাযেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া

ছাড়িয়া দিলেন, তখন হার্ম্মোনিয়ম্ বাজান' জ্যোতিবাবুর একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন স্বর্গীয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী মহাশয় গান করিতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে বোম্বাই অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুদিন গায়ক ছিলেন। জ্যোতিবাবু ইঁহাদের দুইজনের গানের সঙ্গেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেন। এইরূপে ভাল গায়কের সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার হার্ম্মোনিয়মে হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। সকলেই তখন ইঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজনার খুব প্রশংসা করিতেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তখন হার্ম্মোনিয়মবাদক বলিয়া আমার খুব একটা নামডাকও ছিল। কিন্তু এখন এত ভাল ভাল হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়ে হইয়াছেন যে, তাঁহাদের কাছে আমি কলিকা পাইবারও উপযুক্ত নই।"

ব্রাহ্মসমাজে এবং বাঙ্গলা গানের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়ম বাজান', এই প্রথম সুরু হইল। তৎপূর্ব্বে অনেকেই এই যন্ত্রের সহিত অপরিচিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিলেন—

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সদাসর্ব্বদাই একখানি নোট্‌বুক্ থাকিত ; যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত, তাহাই সেই নোট্‌বুকে তিনি টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম! পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, পিয়ানো বাজান' সহজ কি হার্ম্মোনিয়ম বাজান' সহজ, নানা প্রশ্নোত্তরের পর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লই-লেন। তাঁহার আবার "good day" "bad day" ছিল। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তখনি এক পেয়ালা করিয়া চা খাইতেন। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে "উঃ"—"আঃ" করিতে করিতে

সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই ঘটিল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। * * * * ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।"

উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। সে জন্য তাঁহার সাংসারিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে হয়। স্কুল ছাড়্‌বার পর অক্ষয়বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও বাসগ্রামের গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সংবাদ-প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। একদিন অবসরমত ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া, তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া দেন। পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষয়কুমার আট টাকায় আরম্ভ করিয়া, দুই এক মাসের মধ্যেই চৌদ্দ টাকা বেতনে তাহার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি একখানি ভূগোল রচনা করেন। ১৬৭৪ শকে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "বিদ্যা-দর্শন" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা ছয় মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল। ১৭৬৫শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়বাবু সেখানে যাইতে

মাসিক ষাঠ টাকা বেতনে ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহ চক্ষে দেখিতেন যে, পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনের পদও গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ১৭৭৭শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পত্রিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৭শকে কলিকাতা নর্ম্যালস্কুল স্থাপিত হইলে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বৎসর অবধিই তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, বালী গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তর পরিহার পূর্ব্বক, নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিক্যাল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ণ ও উদ্ভিদ্‌-শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল। তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিস্তম্ভ।

[১৩২২ সালের ভাদ্রের (৮৬৫ সংখ্যক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত" প্রবন্ধ হইতে লেখক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সঙ্কলিত।]